بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



আল-ফিহরাস্

<u>আল্লাহর পৃথিবীতে আমরা প্রতিনিধি</u>

আল্লাহ্ আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন এবং আমাদেরকে কিছু কাজ দিয়েছেন। এই কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য, তিনি আমাদেরকে আবার জীবিত করবেন, যা আমরা সূরা বাকারার ৩০ নং ও আল আন'আমের ১৬৫ নং আয়াতের মাধ্যমে জানতে পারি। তাহলে আমাদেরকে এখন জানতে হবে, প্রতিনিধি কাকে বলে ও তাঁর কাজ কী। যে ব্যক্তি অন্য কোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হয়ে তাঁর আইন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তাঁকে প্রতিনিধি বলে। যেমন, আমাদের দেশের জেলা প্রশাসক (ডিসি)গণ সরকারের প্রতিনিধি, তাঁরা সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন ও সরকারের হয়ে কাজ করেন। আপনি সরকারের আইনের বাইরে কাজ করলে জেলা প্রশাসক আপনাকে বন্দি করে সরকারের আইন অনুসারে শাস্তি প্রদান করবে—একেই প্রতিনিধিত্ব বলে। জেলা প্রশাসক যদি তাঁর কাজ ঠিকমতো না করেন, তাহলে সরকার তাঁকে শাস্তি দেবে বা চাকরিচ্যুত করবে।

আল্লাহর প্রতিনিধি হতে হলে প্রথমে কালিমার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না, তারা ইবলিশের প্রতিনিধি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি কাজ পালন করা ফরজ হয়ে যায়। যথা: নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ও জিহাদ। এর পাশাপাশি আল্লাহ কিছু আদেশ ও নিষেধ করেছেন। এই সকল আদেশ ও নিষেধ যাতে জনগণ সঠিকভাবে পালন করে, তার জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিকে কিছু ক্ষমতা ও নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে তাঁরা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়ন করতে পারে এবং যারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মানবে না তাদেরকে শাস্তি দিতে পারে। তাহলে আমরা দেখবো আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিকে কী কী কাজ দিয়েছেন ও শাস্তি দেওয়ার জন্য কী কী ক্ষমতা দিয়েছেন।

আল্লাহর প্রতিনিধির কাজ ও ক্ষমতা:

১. নামাজ: সকল মুসলমান যাতে সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করতে পারে তা নিশ্চিত করা। দুনিয়ার ব্যস্ততা যাতে তাঁদেরকে আল্লাহ স্মরণ থেকে দূরে রাখতে না পারে, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (আল-বাকারা:১১০, মাঊন:৫)

২. যাকাত: যাদের নিকট প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ জমা আছে (নিসাব পরিমাণ), তাদের থেকে অর্থ নিয়ে ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, চিত্তাকর্ষণকারী, দাস-মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের দেওয়া। (আল-বাকারা: ১১০)

৩. রোজা: দুনিয়ার কষ্ট বা ব্যস্ততার কারণে যাতে অভাবগ্রস্তরা রোজা পালন থেকে দূরে না থাকে, তার জন্য যাকাত থেকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা। (আল-বাকারা:১৮৩, আয-যারিয়াত:১৯)

৪. হজ: যাকাত প্রদান করার পরেও কারো নিকট যদি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার সামর্থ্য থাকে, তাঁকে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য সাহায্য করা। (আল-ইমরান:৯৭)

৫. জিহাদ: উপরোক্ত চারটি কাজ ও আল্লাহর হালাল-হারাম (সুদের আদান-প্রদান বন্ধ, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ব্যভিচার ও অশ্লীল কাজ, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন, জুয়া খেলা এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ব্যবহার, ওজনে কম-বেশি করে ঠকানো, শাতিমে রাসূলের মৃত্যুদণ্ড) বাস্তবায়ন ও শাস্তি প্রদান করতে গেলে কেউ যদি বাধা প্রদান করে, তাহলে তার সাথে আল্লাহর প্রতিনিধিদের যুদ্ধ করা ফরজ। (আল-আনফাল:৩৯, আল-বাকারা:১৯৩,২৭৫,২৭৯)

বর্তমান সরকারের প্রতিনিধিগণ (বিচারক, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীরা) যেভাবে সরকারের আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি বাস্তবায়ন করছেন, ঠিক সেভাবেই আল্লাহর প্রতিনিধিদেরও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। যেহেতু বর্তমান সরকার আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করছে না, সেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধির জন্য একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন, কারণ রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যতিরেকে প্রতিনিধিত্ব করা যায় না, অর্থাৎ ওপরের পাঁচটি ফরজ কাজ বাস্তবায়ন করা যায় না।

ইসলামিক অর্থনীতি

ইসলামিক অর্থনীতির মূল কাজ হলো সমাজে ইনসাফ বজায় রেখে অর্থের প্রবাহ ঠিক রাখা।

ইসলামিক রাষ্ট্রের জনগণ যে সকল সুবিধা পাবে:
ক. ইসলামিক সরকার কিছু খাত থেকে কোনো ফি (খাজনা) নেবে না। বর্তমান সরকার খাজনা বা কর নাম দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ লুট করছে, সেই খাতগুলো হলো: শিক্ষা খাতে রেজিস্ট্রেশন, গাড়ি নিবন্ধন, সম্পদ হস্তান্তর, বিবাহ নিবন্ধন, লাইসেন্স এবং পারমিট। এই সকল খাজনা বা করের কারণে জনগণ দিন দিন গরিব হচ্ছে।

খ. ইসলামিক সরকার হাট-বাজার থেকে খাজনা তোলা বন্ধ করে দেবে। আপনি বাড়ি থেকে নারকেল, সুপারি, হাঁস, মুরগি বিক্রয় করার জন্য হাটে নিয়ে গেলে, তা বিক্রয় করার পরে বর্তমান সরকারের ইজারাদার আপনার থেকে খাজনা আদায় করে। অভাবের কারণে আপনি এই সকল পণ্য বিক্রয় করছেন। এই সকল পণ্য থেকে খাজনা আদায় করা কি ঠিক?

গ. ইসলামিক সরকার বসত বাড়ি/ জমির উপর খাজনা বন্ধ করে দিবে। বর্তমান সরকার বসত বাড়ি/ জমির ওপর খাজনা আদায় করে। আল্লাহর জমি আপনি মালিক সরকারকে কেন খাজনা দিতে হবে। ধরুন বন্যার কারণে আপনার জমিতে ফসল হন নাই, কিন্তু আপনাকে জমির খাজনা দিতে হবে। তাও আবার দেরি করে দিলে খাজনার উপর সুদ দিতে হয়। কাফেররা মুসলিম দেশে বসবাস করলে কর দিতে হয়, আমরা কি কাফের যে সরকারকে কর দেব?

ঘ. ইসলামিক সরকার গাড়ির ইনস্যুরেন্স এবং মামলা বন্ধ করে দেবে। বর্তমান সরকার গাড়ির ইনস্যুরেন্স ও মামলা দিয়ে বিপুল অর্থ লুট করছে, এতে করে আমাদের জনগণ দিন দিন গরিব হচ্ছে।

ঙ. ইসলামিক সরকার মোবাইল কল, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল থেকে কোনো প্রকার ভ্যাট কর্তন করবে না। আপনি মিটারে ৫০০ টাকা প্রবেশ করালে, বর্তমান সরকার বিভিন্ন খাত দেখিয়ে ১৫০ টাকা কেটে নেয়, বাকি ৩৫০ টাকা মিটারে প্রবেশ করে। ইসলামিক সরকার আপনার ৫০০ টাকা সম্পূর্ণই মিটারে প্রবেশ করাবে।

চ. ইসলামিক সরকার সকল প্রকার মূল্য সংযোজন কর (VAT) বন্ধ করে দেবে। বর্তমান সরকার কর (VAT) বসিয়ে জনগণের সম্পদ লুট করছে। যেমন: আপনি মোবাইলে ১০০ টাকা রিচার্জ করলে কার্যত মাত্র ৪৩ টাকা ৭০ পয়সা ব্যবহার করতে পারবেন। এ থেকে বুঝতে পারছেন, বর্তমান সরকার কী পরিমাণ অর্থ লুট করছে।

ছ. ইসলামিক সরকার সকল প্রকার আয়কর কর্তন বন্ধ করে দেবে। বর্তমান সরকার আয়কর এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর সরাসরি কর ধার্য করে। আমাদের রক্তমিশ্রিত অর্থ থেকে সরকার কী পরিমাণ অর্থ লুট করছে, তা আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। যেমন: আপনি প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা আয় করেন। তাহলে সরকারকে ৫,৬২৫/- আয়কর দিতে হবে। এরপর আপনি বিদ্যুৎ বিল দিতে গেলে সেখানে কর (VAT), প্যাকেটজাত পণ্য কিনতে গেলে সেখানে কর (VAT)। এইভাবে আপনার থেকে মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা কর কেটে নেওয়া হয়।

জ. ইসলামিক সরকার জেলেদেরকে নদীতে ১২ মাস মাছ ধরতে দেবে। আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ। আমরা মাছ ধরব আর খাব–এইটাই আমাদের সামাজিক নীতি। কিন্তু বর্তমানে ভারতে মাছ পাচার করার জন্য নদীতে মাছ ধরা নিষেধ করা হয়।

ঝ. ইসলামিক সরকার সকল মসজিদে ও মাদ্রাসাতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেবে এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ সরকারি ভাবে বেতন পাবেন। ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ ইসলামিক সরকারের নিকট সম্মানিত।

ঞ. ইসলামিক সরকারের নিকট প্রবাসীরা অনেক সম্মানিত। যে সকল প্রবাসী বিদেশে অসুস্থ হয়ে দেশে আসবেন, তাঁদের জন্য ইসলামিক সরকার চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (ফ্রি) করে দেবে। ইসলামিক সরকার প্রবাসীদের কথা শুনেছে যে, তাঁরা বিদেশে চিকিৎসককে বুঝিয়ে নিজের অসুস্থতার কথা বলতে পারে না। এই জন্য তাঁদেরকে দেশে আসতে হয়।

ট. ইসলামিক সরকার সকল চালকের ঘুম নিশ্চিত করার জন্য মহাসড়কের পাশে টার্মিনাল ও মুসাফিরখানা তৈরি করে দিবে, যাতে সড়কে দুর্ঘটনা কমে যায়। মুসাফিরখানা কারণে তাঁদেরকে নামাজের আওতায় আনাও সহজ হবে।

ঠ. ইসলামিক সরকার গ্রুপ কোম্পানির ব্যবসায় সীমাবদ্ধতা আনবে। বর্তমানে গ্রুপ কোম্পানিগুলো বেশি ঋণখেলাপি, তাদেরই কারণে ছোট ব্যবসায়ীরা লোকসানে আছে এবং যুবকরাও নতুন ব্যবসার সুযোগ পাচ্ছে না।

ড. ইসলামি সরকার 'করজে হাসানা' প্রথা চালু করবে। দেশের মধ্যে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, ক্ষুদ্রঋণ কোম্পানি, এনজিও, এমএলএম কোম্পানি ও সমবায় কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারা জনগণকে ঋণ দিয়ে গোলাম বানিয়ে সম্পদ লুণ্ঠন করে। এদের কারণে গরিব দিন দিন গরিব হচ্ছে।

ঢ. ইসলামি সরকার প্রতি চল্লিশ (৪০) কি: মি: সড়ক ১ বছরের মধ্যে পুনর্নির্মাণ করবে। বর্তমানে দেশে চল্লিশ (৪০) কি: মি: সড়ক করতে সময় লাগে ২ থেকে ৩ বছর। এই দীর্ঘ সময়ের কারণে জনগণ ও যানবাহন ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এদের সীমাহীন দুর্নীতির কথা আর নাই বললাম।

ণ. ইসলামি সরকার এক (১) বছরের মধ্যে সকল জমির মামলা নিষ্পত্তি করবে। বর্তমান বিচার ব্যবস্থায় আপনি বছরের পর বছর ধরে মামলা চালান অথচ কোনো ফলাফল পান না। তার ওপর উকিলকে অর্থ দিতে দিতে আপনার সম্পদ তলানিতে চলে যায়। শেষে দেখা যায় আপনার সময় ও অর্থ দুটিই বৃথা যায়।

ত. ইসলামি সরকার সকল নদী-খাল পরিষ্কার করবে, শুধু সেন্টমার্টিন বা সাদা পাথর নয়। বর্তমানে দেশে কোম্পানিদের ছোট প্যাকেটে নদী-খাল ভরে গেছে। যার ফলে মাছ উৎপাদন কমে গেছে।

ম. ইসলামি সরকার সকল পুরুষের জন্য ব্যবসা বা চাকরি নিশ্চিত করবে। বর্তমানে দেশে অনেক বেকার আছে যার প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ করা হয় না।

ইসলামিক রাষ্ট্রের জনগণ সামাজিক যে সকল সুবিধা পাবে:

ক. ইসলামি সরকার জন্মনিবন্ধন পদ্ধতি বাদ দিয়ে দেবে। যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করবে তাদের কোনো জন্মনিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। জাতীয় পরিচয়পত্র হলেই যথেষ্ট।

খ. ইসলামি সরকার বিনামূল্যে (ফ্রি) সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে। সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে।

গ. ইসলামি সরকার সকল গার্মেন্টস কর্মী, কারখানা কর্মী ও দিনমজুরের জন্য পাঁচ (৫) ওয়াক্ত নামাজের ব্যবস্থা করবে, যাতে তারা ইবাদত ও বিশ্রাম নিতে পারে।

ঘ. ইসলামি সরকার আহলে জিম্মাহদের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করে দেবে, যা তাদের ধর্মীয় নীতি অনুসারে পরিচালিত হবে।

ঙ. ইসলামি সরকার অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড এক (১) বছরের মধ্যে কার্যকর করবে। আল্লাহর নির্দেশে এই শাস্তি, কারো ব্যক্তিগত নীতি নয়।

চ. ইসলামি সরকার বসতবাড়িতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাথমিক সকল শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করবে। বর্তমান সময়ে স্কুলে নাচ-গান শেখানো হলে অথচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শেখানো হয় না।

ছ. ইসলামিক সরকার বস্তুহারাদের জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেবে। গণতান্ত্রিক সরকার বস্তুহারাদের জমি না দিয়ে, নিজের জন্য অনেক জমি বরাদ্দ করে। যে সরকার জনগণকে জমি দিতে পারে না, সেই সরকার কীভাবে গণতান্ত্রিক সরকার হয়?

জ. যারা প্রতি মাসে দেশে রেমিটেন্স পাঠান, ইসলামিক সরকার তাদের বিমান ভাড়া থেকে কোনো প্রকার কর নেবে না। আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা অনেক কষ্ট করে দেশে রেমিটেন্স পাঠায়। আর সরকারের মন্ত্রীরা কাগজের নোট ছাপিয়ে আমাদের দেয় এবং বলে খরচ করো। অন্যদিকে, তারা সব রেমিটেন্স বিদেশে তাদের বউ-বাচ্চার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এখন দেশের মধ্যে কাগজের টাকা বেশি হয়ে গেছে, তখন গ্রুপ কোম্পানিগুলোকে বলে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে। তারা দাম বাড়িয়ে দেওয়ায় কারণে আমরা ১ টাকার পণ্য ৫ টাকা দিয়ে কিনতে হয়।

ঝ. ইসলামিক সরকার বিনামূল্যে রেমিটেন্স যোদ্ধার মৃতদেহ তাদের স্বজনদের নিকট পৌঁছে দেবে। বর্তমানে সবাই বলে প্রবাসীরা আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা অথচ এই যোদ্ধা যখন প্রবাসে মৃত্যুবরণ করে তখন বর্তমান সরকার তাদের মৃতদেহের কোনো খবর রাখে না।

ঞ. ইসলামিক সরকার বিনামূল্যে পাসপোর্ট প্রদান করবে। যেসব প্রবাসী ভাই সঠিক পথে দেশে রেমিটেন্স পাঠাবেন, তাঁদেরকে বিনামূল্যে (ফ্রি) পাসপোর্ট প্রদান করা হবে।

ট. ইসলামিক সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস বোতলজাত করে বিক্রি করবে। বর্তমান সরকার আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস কম দামে গার্মেন্টস খাতে দিয়ে আমেরিকান পণ্যের দাম কমায়। যদিও আমরা রেমিটেন্স পাই, তাতে লাভ কী, সকল রেমিটেন্স আবার মন্ত্রীরা বেগম পাড়ায় পাচার করে। অন্য দিকে, আমাদের নদীসমূহ ধ্বংস হচ্ছে গার্মেন্টসের বর্জ্য দিয়ে। তার ওপর আমাদেরকে বেশি দামে এলপিজি গ্যাস কিনতে হয়।

ইসলামিক সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার আয়ের উৎসসমূহ: ইসলামিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থ আয় কীভাবে করবে। বলে রাখি, ইসলামিক সরকার পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকারের অর্ধেক (৫০%) অর্থ হলেই যথেষ্ট।

ক. যেই সকল ব্যবসা একক মালিকানাধীন হলে সম্পদ পুঞ্জীভূত হবে, সেই সকল ব্যবসা ইসলামিক সরকার করবে। উক্ত ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে ইসলামিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। যেমন: লোহা, বালু, পাথর, সিমেন্ট, সকল প্রকার তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, কল, কেমিক্যাল সহ বিভাজন অযোগ্য ব্যবসা ইসলামিক সরকার করবে।

খ. দেশে ১টি মাত্র সুদবিহীন ব্যাংক থাকবে যা নিয়ন্ত্রণ করবে ইসলামিক সরকার। ব্যাংক থেকে আয়কৃত অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যয় করবে।

গ. সেতু ও উন্নয়নের জন্য জনগণের নিকট বিনিয়োগ চাওয়া হবে। ইসলামিক সরকারও বিনিয়োগ করে যে অর্থ আয় করবে তা রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় করবে।

ঘ. ইসলামিক সরকারের কেন্দ্রিয় কোষগারকে 'বাইতুল মাল' বলা হয়। ইসলামিক সরকার বাইতুল মাল পূরণের জন্য জনগণের নিকট অনুদান চাইবে।

ঙ. ইসলামিক সরকার ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ব্যবসা নীতির কারণে পণ্য সরবরাহ (সাপ্লাই চেইন) ঠিক রাখার জন্য ইসলামিক সরকার ব্যবসা করবে। পণ্য সরবরাহ থেকে অর্জিত অর্থ রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় করবে।

চ. ইসলামিক সরকার বন্দর, বিমান, রেল ও গণপরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তা রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় করবে।

অর্থনীতির উপর পাঁচটি প্রধান প্রভাব: এখন আপনি ঘর বানাতে গেলে লোহা ও সিমেন্ট কিনতে বড় কোম্পানিকে যে টাকা দেন, তার বড় অংশ লাভ হিসেবে মালিকের পকেটে যায়। কিন্তু ইসলামিক সরকারে এই লোহা-সিমেন্ট রাষ্ট্র দেবে। ফলে এই ব্যবসার মুনাফা দিয়ে আপনার এলাকার রাস্তা, স্কুল আর হাসপাতাল তৈরি হবে। আপনার টাকা আপনার কাছেই ফিরে আসবে।

১. **দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা (সাপ্লাই চেইন নিয়ন্ত্রণ)**: সরকার যখন নিজেই চাল, ডাল, তেল বা এলপিজি গ্যাসের সাপ্লাই চেইন নিয়ন্ত্রণ করবে, তখন মাঝপথে কেউ পণ্য মজুদ করে দাম বাড়াতে পারবে না। সাধারণ মানুষ সবসময় ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবে।

২. **বেকারত্ব দূরীকরণ ও শিল্পায়ন**: ভারী শিল্প (লোহা, সিমেন্ট, কেমিক্যাল) সরকারি মালিকানায় থাকলে সেখানে বিশাল কর্মসংস্থান তৈরি হবে। ব্যবসার লভ্যাংশ দিয়ে নতুন নতুন কলকারখানা রাষ্ট্র নিজেই তৈরি করবে।

৩. **সুদবিহীন স্বচ্ছ ব্যাংকিং**: দেশে একটি মাত্র ব্যাংক থাকায় হিসাব রাখা সহজ হবে। সুদের বদলে অংশীদারিত্ব বা সার্ভিস চার্জ ভিত্তিক ব্যবস্থা থাকায় মানুষ ঋণের জালে আটকে মরবে না। এতে মুদ্রাস্ফীতি (টাকার মান কমে যাওয়া) নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৪. **সামাজিক নিরাপত্তা (বাইতুল মাল)**: বাইতুল মালের মাধ্যমে যাকাত ও অনুদান সংগ্রহ করে সরাসরি অভাবী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কেউ না খেয়ে থাকবে না এবং এটি হবে ভিক্ষুকমুক্ত দেশ গড়ার মূল হাতিয়ার।

৫. **ট্যাক্স ফ্রি জীবনযাত্রা**: রাষ্ট্র যখন বড় বড় খাত (তেল, গ্যাস, বন্দর) থেকে আয় করবে, তখন জনগণের ওপর ভ্যাট বা ইনকাম ট্যাক্সের চাপ রাখার দরকার হবে না। এতে মানুষের হাতে জমানো টাকা বাড়বে, যা জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক মূল্যায়ন: "ঋণ-নির্ভরতা থেকে সম্পদ-নির্ভরতা" বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ঋণভিত্তিক অর্থনীতির ওপর দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। ইসলামিক মডেলটি এই ধারাকে ভেঙে সম্পদভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করবে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ: যেহেতু একটি মাত্র সুদবিহীন ব্যাংক থাকবে, তাই বাজারে টাকার কৃত্রিম সরবরাহ বন্ধ হবে। এতে টাকার মান স্থিতিশীল থাকবে এবং জিনিসের দাম হুটহাট বাড়বে না।

দুর্নীতি হ্রাস: যখন লোহা, বালু, সিমেন্ট এবং তেলের মতো বড় খাতগুলো সরাসরি রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে, তখন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং বড় বড় বেসরকারি টেন্ডার জালিয়াতির সুযোগ কমে যাবে।

সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন: "মালিকানাবোধ ও নিরাপত্তা" নতুন মডেলে জনগণের নিকট থেকে বিনিয়োগ চাওয়া এবং বাইতুল মালে অনুদান চাওয়ার বিষয়টি নাগরিক ও সরকারের মধ্যে একটি 'পারস্পরিক আস্থা' তৈরি করবে।

উদ্যোক্তা তৈরি: বড় বড় কঠিন ব্যবসাগুলো (যেগুলো বিভাজন অযোগ্য) সরকার নিয়ে নেওয়ায় সাধারণ মানুষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় বেশি মনোযোগী হতে পারবে। তারা জানবে যে কাঁচামাল (লোহা, কেমিক্যাল, গ্যাস) সরকার সরবরাহ করছে, তাই এখানে বড় কোনো কোম্পানি তাদের ধ্বংস করতে পারবে না।

মানবিক সমাজ: বাইতুল মাল শুধু একটি তহবিল নয়, এটি মানুষের মনে এই প্রশান্তি দেবে যে– "আমার বিপদ হলে রাষ্ট্র আছে।" এটি সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে আনবে।

ভূ-রাজনৈতিক মূল্যায়ন: "প্রকৃত সার্বভৌমত্ব" একটি দেশ তখনই পুরোপুরি স্বাধীন হয় যখন তার অর্থনীতির চাবিকাঠি নিজের হাতে থাকে। নতুন প্রস্তাবিত এই মডেলটি বাংলাদেশকে বৈশ্বিক ঋণদাতা সংস্থাগুলোর (যেমন IMF বা World Bank) প্রেসক্রিপশন থেকে মুক্ত করবে।

স্বনির্ভরতা: নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ নিজেরা ব্যবহার করে এবং সেই লভ্যাংশ দিয়ে রাষ্ট্র চালালে বিদেশি শক্তির চাপ কমে যাবে।

চূড়ান্ত বিশেষণ: ইসলামিক প্রস্তাবটি কেবল একটি অর্থনৈতিক হিসাব নয়, এটি একটি 'ইনসাফভিত্তিক সমাজ' গঠনের লক্ষ। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেখানে ধনী আরও ধনী হয়, সেখানে ইসলামিক এই মডেলে 'সম্পদ' নির্দিষ্ট কয়েকজনের হাতে বন্দি না থেকে পুরো রাষ্ট্রের ধমনিতে রক্তসঞ্চালনের মতো প্রবাহিত হবে। এটি বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশে কোনো অভাবী মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

বর্তমান বাজেটের চেয়ে কত টাকা বেশি হতে পারে: ইসলামিক সরকারের আয়ের উৎসে বর্তমান বাজেটের চেয়ে কয়েকভাবে বেশি অর্থ বা সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে আসবে।
১. বিশাল কর-সাশ্রয়: বর্তমানে এনবিআর-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে যে বিশাল কর (৪.৯৯ লাখ কোটি টাকা) নেওয়া হয়, নতুন মডেলে সরকার সরাসরি সম্পদ (তেল, গ্যাস, লোহা) বিক্রি করে সেই আয় করবে। এতে জনগণের হাতে বেশি টাকা থাকবে।
২. সুদ পরিশোধের সাশ্রয়: বর্তমান বাজেটে প্রায় ১,২২,০০০ কোটি টাকা শুধু ঋণের সুদ পরিশোধে ব্যয় হয়। নতুন সুদবিহীন মডেলে এই বিশাল টাকাটা সরাসরি সাশ্রয় হবে।
৩. সিন্ডিকেট লভ্যাংশ: বর্তমানে লোহা, সিমেন্ট বা তেলের ব্যবসার সিংহভাগ মুনাফা বেসরকারি মালিকরা পায় (যা প্রতি বছর কয়েক লক্ষ কোটি টাকা)। এই লভ্যাংশগুলো সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষগারে (বাইতুল মাল) আসবে।

আনুমানিক আর্থিক প্রভাবের হিসাব:
নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী সকল বিভাজন অযোগ্য ব্যবসা (যেমন লোহা, বালু, পাথর, সিমেন্ট, সকল তেল-গ্যাস) রাষ্ট্র পরিচালনা করলে:
সরাসরি আয় বৃদ্ধি: বর্তমানের অ-কর রাজস্ব ৪৬,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে অন্তত ৩,৫০,০০০ - ৪,০০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।
সুদ সাশ্রয়: বছরে ১,২২,০০০ কোটি টাকা বেঁচে যাবে।
বাইতুল মাল: যাকাত ও অনুদান ভিত্তিক তহবিলে আনুমানিক ৫০,০০০ - ৮০,০০০ কোটি টাকা জমা হতে পারে।
রেমিট্যান্স: প্রবাসী আয় (গার্মেন্টস বাদে) ৩,৭০,০০০ কোটি টাকা। এই টাকা দিয়ে রাষ্ট্র বিদেশ থেকে পণ্য কিনে যদি ১০% মুনাফা করে, তবে মোট লভ্যাংশ দাঁড়ায় ৩৭,০০০ কোটি টাকা।
মসজিদ ভিত্তিক আয়: ৩ লক্ষাধিক মসজিদ থেকে বছরে আনুমানিক ১৫,০০০ - ২০,০০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হতে পারে। যেহেতু মসজিদ ইসলামিক সরকারের গ্রাম কার্যালয়, তাই মসজিদ ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ও উদ্বৃত্তের হিসাব: বর্তমানে বাজেটের একটি বড় অংশ (প্রায় ২.৫ - ৩ লক্ষ কোটি টাকা) ঘাটতি থাকে, যা ঋণ নিয়ে পূরণ করতে হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত ইসলামিক মডেলে সুদ সাশ্রয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবসার লভ্যাংশ যোগ হওয়ায় এই বিশাল ঘাটতি পুরোপুরি দূর হবে। সব খরচ মেটানোর পর ইসলামিক হিসাব অনুযায়ী রাষ্ট্রে ১,১৯,০০০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত (Surplus) থাকবে। এই উদ্বৃত্ত ১,১৯,০০০ কোটি টাকা যদি পুনরায় ১০% মুনাফা-ভিত্তিক বিনিয়োগে খাটানো হয়, তবে রাষ্ট্রের আয় প্রতি বছর জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। ফলে সরকারকে কোনো সুদ বা ঋণের বোঝা বইতে হবে না এবং বাজেট হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ইসলামিক নিয়মে ও গণতান্ত্রিক নিয়মে পরিচালনা পদ্ধতি (পার্থক্যসমূহ)

সভ্যতা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সূত্র আছে, যার নাম 'সভ্যতা'। এই সভ্যতাকে ব্যবহার করেই রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করা হয়। আমরা এখন দেখব বর্তমানে রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হয় এবং পাশাপাশি ইসলামিক নিয়মগুলোও দেখব; যাতে আমরা একটি ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি।

সভ্যতার বারোটি (১২) মৌলিক সূত্র হলো যথাক্রমে:
১. সরকার ২. বিচার ৩. ব্যবসা-বাণিজ্য ৪. শিক্ষা ৫. বিবাহ ৬. পরিবার ৭. মূল্যবোধ ৮. চিকিৎসা ৯. সংস্কৃতি ১০. যোগাযোগ ১১. লিখন পদ্ধতি এবং ১২. সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন।

সরকার বা শাসক: সভ্যতার সংবিধানকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য যে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা হয়, তাকে শাসনতন্ত্র বলে। শাসনতন্ত্রের সংবিধান অনুসারে জাতিকে পরিচালনা করার কেন্দ্রকে সরকার বা শাসক বলে। (আন-নিসা: ৫৯)

সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. প্রার্থী ও যোগ্যতা	ঈমানদার প্রার্থী: ইসলামিক পদ্ধতিতে মুসলিম বিবাহিত পুরুষ যিনি আল্লাহর সব আদেশ-নিষেধ মান্য করে এবং সুন্নত মোতাবেক পরিচালিত হন। যিনি আল-কোরআন ও হাদিসের উপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তিনিই জাতির নেতা হওয়ার প্রার্থী হতে পারবেন। সেই সকল প্রার্থীর উপস্থিতিতে ইসলামিক রাষ্ট্রের জন্য মন্ত্রী নির্বাচন করা হয়। ইসলামিক পদ্ধতিতে ব্যক্তির আমল দেখা হয়।	মিশ্র প্রার্থী: গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুমিন, মুনাফিক, কাফের, সুদী ব্যবসায়ী, ব্যভিচারী ও জুলুমকারী সহ যে কেউ জাতির নেতা হওয়ার প্রার্থী হতে পারেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যক্তির আমল দেখা হয় না। এই সকল কারণে বর্তমান সরকার দাজ্জালের অনুসারী।
২. নির্বাচন পদ্ধতি	শুরা পদ্ধতি: ইসলামিক সরকার নির্বাচনের সময় কোনো মুনাফিক ও কাফেরের সমর্থন নেওয়া হয় না। কারণ, মুনাফিক ও কাফের ইবলিশ ও দাজ্জালের অনুসারী, তারা কখনো চায় না পরহেজগার ব্যক্তি সরকার হোক। তাই নির্বাচনের সময় যিনি মুমিনদের কাছে সবচেয়ে পরহেজগার, তিনিই হবেন শুরা সদস্য। সেই সদস্যের মধ্য থেকে সরকার গঠন করা হয়। ইসলামে দল গঠনের মাধ্যমে সরকার নির্বাচন হয় না।	ভোট পদ্ধতি: গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচনের সময় দেশে দুই বা ততোধিক দল থাকতে হবে। যেই দলের সংখ্যা বেশি, সেই দল সরকার গঠন করে। এতে করে সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক কম সংখ্যককে নির্যাতন করে। যার কারণে সমাজে মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়।
৩. সংবিধান	সংবিধান আল-কোরআন: ইসলামিক সরকার দেশ পরিচালনা করে কোরআন ও হাদিস অনুসারে। এখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কর্তৃত্ব চলে না। মুসলিম জনগণ এই সংবিধান সংরক্ষণ করে।	সংবিধান নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার: গণতান্ত্রিক সরকার দেশ পরিচালনা করে দাজ্জাল কর্তৃক লিখিত গণতন্ত্রের সংবিধান 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর মাধ্যমে। জাতিসংঘ বা দাজ্জাল সংঘ এই সংবিধান সংরক্ষণ করে।

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
৪. আয়ের উৎস	হালাল আয়: ইসলামিক সরকারের নেতারা ক্ষমতা ব্যবহার করে হারাম আয় করে আয়েশি জীবনযাপন করার বা অন্য দেশে থাকার সুযোগ পান না। তাদের আয় হালাল।	হারাম আয়: গণতান্ত্রিক সরকারের নেতারা ক্ষমতা ব্যবহার করে হারাম আয় করেন। আমেরিকাতে নিরাপদে আয়েশি জীবনযাপন করার সুযোগ পায় সেই হারাম ইনকাম দিয়ে।
৫. জনমানসে বিশ্বাস	বিশ্বাস: ইসলামিক শুরা পদ্ধতিতে নির্বাচিত ব্যক্তিগণকে সমাজের সবাই বিশ্বাস করে। কারণ, সমাজে বিশ্বাসী ও পরহেজগার হলে তবেই তিনি শুরা সদস্য হতে পারেন।	অবিশ্বাস: গণতান্ত্রিক ভোট পদ্ধতিতে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশেরই সমাজে দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিতি থাকে।
৬. নির্বাচন প্রক্রিয়া	খিলাফত নীতি: দেশে ৫ ধাপে শুরা নির্বাচন হয়: রাষ্ট্রীয় শুরা, বিভাগীয় শুরা, জেলা শুরা, উপজেলা শুরা ও মসজিদ শুরা। ইসলামিক নীতি অনুযায়ী সমাজের প্রধান নেতা মসজিদের ইমাম হবেন। ইসলামিক শুরা নির্বাচন এককালীন হওয়ার কারণে এর ব্যয় খুব কম।	গণতন্ত্রের নীতি: দেশে তিন ধাপে ৫ বছর পর পর ভোট হয়: সংসদ নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন, গ্রাম সরকার নির্বাচন। বেশি নির্বাচন প্রক্রিয়া হওয়ার কারণে দেশের অর্থ বেশি ব্যয় হয়।
৭. ব্যক্তি প্রত্যাহার	পদত্যাগ: নিম্নলিখিত কারণে ব্যক্তি পদত্যাগ করবেন: (১) কোনো ফরজ বিধানকে অমান্য করলে; (২) আমিরুল মুমিনিন নির্দেশ প্রদান করলে; (৩) বয়স বেশি হলে; (৪) শারীরিকভাবে অক্ষম হলে; (৫) পাগল হলে।	অটল থাকা: গণতন্ত্রের সংবিধান অনুযায়ী জনগণ চাইলেও ব্যক্তি পদত্যাগ করেন না বরং বল প্রয়োগ করে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।
৮. মূল লক্ষ্য	আল্লাহ: খিলাফতভিত্তিক সরকারের প্রভু আল্লাহ। তারা আল্লাহকে দেখানোর জন্য কাজ করে।	ইবলিশ ও দাজ্জাল: গণতান্ত্রিক সরকারের প্রভু ইবলিশ ও দাজ্জাল। তারা বিদেশীদের অর্থাৎ আমেরিকা, ইউরোপ, জাতিসংঘকে দেখানোর জন্য কাজ করে।
৯. দল বা সংগঠন	কোনো দল নেই: খিলাফত সংবিধান অনুযায়ী ইসলামে কোনো দল নেই। ইসলাম সরাসরি শাসক গঠন করে। আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) এবং আলী (রা.)—তাঁদের কোনো দল ছিল না।	বহুদলীয়: গণতন্ত্রের সংবিধান অনুযায়ী যত ইচ্ছা দল করতে পারবেন। বেশি দল হওয়ার কারণে সমাজে মতভেদ বেশি।
১০. পরিচালনা ব্যয়	অল্প ব্যয়: এই ব্যবস্থা পরিচালনা করতে বর্তমান সরকারের অর্ধেক অর্থ হলেই হবে। কারণ এখানে বিলাসিতা, সুদ-ঘুষ, দুর্নীতি নেই। সাধারণ জনগণ সম্পদশালী থাকে।	বিপুল ব্যয়: উচ্চ বিলাসিতা দেখিয়ে এই ব্যবস্থা টিকে থাকে। যার কারণে তারা জনগণের উপর কর আরোপ করে এবং বিদেশ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করে।
১১. ব্যবস্থার উৎস	সৃষ্টিকর্তার তৈরি: এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, বরং সর্বকালের জন্য আধুনিক এবং ত্রুটিমুক্ত 'স্বয়ংক্রিয় ও নিখুঁত ইঞ্জিন'। এর নির্মাতা স্বয়ং বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তাই এতে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি বা নকশাগত দুর্বলতা নেই।	মানুষের তৈরি: এটি মানুষের তৈরি পুরাতন পদ্ধতি, যা সংস্কার করে আধুনিক করা যায় না। এটি পুরাতন মডেলের ইঞ্জিনের মতো যা সংস্কার করে চালাতে গিয়ে বারবার দুর্ঘটনার (পিলখানা, উসমান হাদি, জুলাই) কবলে পড়ে।

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১২. পরিচালনা পদ্ধতি	মসজিদমুখী: রাষ্ট্রীয় সকল প্রাথমিক কাজ মসজিদের শুরা সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার কারণে সকলে সহজেই সমস্যার সমাধান পায়, যা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনে এবং সকলকে মসজিদমুখী করে।	মসজিদবিমুখ: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো মেম্বার, চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার এবং সচিব বা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীদের মাধ্যমে জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করে; যা একটি বিশাল আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল।
	ইসলামিক রাষ্ট্রের সম্ভাব্য মন্ত্রণালয়সমূহ- (২১) টি	গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয়সমূহ- (৪৩) টি
১৩. মন্ত্রণালয় সমূহ	১. শুরা সদস্য নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২. প্রধান আমিরের কার্যালয় ৩. ফরজ ও সুন্নাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪. ইসলামিক আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫. সৎ কাজের প্রচার ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ মন্ত্রণালয় ৬. প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭. আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮. খাদ্য উৎপাদন ও ত্রাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৯. ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০. চিকিৎসা ও ওষুধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১১. অর্থ ও বাইতুল মাল বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১২. ইসলামিক শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৩. ভূমি ও সম্পদ বণ্টন বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৪. যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৫. শরণার্থী ও পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৬. মসজিদ শুরা ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৭. জনপ্রশাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৮. সংস্কৃতি ও সম্প্রচার বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯. সশস্ত্র মুজাহিদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০. স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২১. পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১. রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ২. প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ৩. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ৪. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৬. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৭. কৃষি মন্ত্রণালয় ৮. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৯. সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ১০. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৪. অর্থ মন্ত্রণালয় ১৫. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৭. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৮. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ১৯. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০. ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২১. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ২২. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২৪. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৫. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২৬. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৭. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২৮. খাদ্য মন্ত্রণালয় ২৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩০. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৩১. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৩২. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৩৩. ভূমি মন্ত্রণালয় ৩৪. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৩৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩৬. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩৭. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩৮. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৩৯. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৪০. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪১. রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৪৩. শিল্প মন্ত্রণালয়

বিচার: দেশ পরিচালনার জন্য সংবিধান লেখা হয়। সেই সংবিধানকে বাস্তবায়ন করার জন্য আইন করা হয়। আর সেই আইন অমান্য করলে আপনি হয়ে যাবেন অপরাধী। আপনার অপরাধ নিশ্চিত করে শাস্তি দেওয়াকে বিচার বলে। (আল-আ'রাফ: ৫৪)

বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. আইনের উৎস ও বিচারক	আল-কোরআনের আইন: ইসলামিক সরকার যেই আইন দিয়ে বিচার করে, তা হলো আল-কোরআনের আইন। আমাদের দেশে ইসলামিক আইন শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন মুফতি, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ। তাদের মধ্য থেকেই বিচারক (কাযী) ও আইনজীবী নিযুক্ত করা হয়। মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামিক আইনের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি।	জুপিটারের আইন: বর্তমানে রোমান দেবতা জুপিটারের আইন দিয়ে বিচার করা হয়। এই আইন শিক্ষার জন্য উচ্চ পর্যায়ের লোক আমেরিকায় গিয়ে পিএইচ.ডি. করে দেশে এসে বিচার করে। একটি স্বাধীন দেশের আইন শিক্ষার জন্য আমেরিকায় যেতে হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক।
২. আইন প্রণয়ন পদ্ধতি	আল্লাহর আইন: ইসলামিক আইনকে আল-কোরআন ও হাদিস রচিত আইন বলা হয়। আল-কোরআন ও হাদিসের নিয়ম অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে ইসলামিক বিচার সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।	মানব রচিত আইন: বর্তমান আইনকে মানব-রচিত আইন বলা হয়। এই আইন প্রণয়ন করা হয় গণতন্ত্রের সংবিধান 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর নিয়ম অনুযায়ী। এই আইন অমান্য করলে আপনি 'জঙ্গি' হিসেবে গণ্য হবেন।
৩. সামাজিক আদর্শ ও নৈতিকতা	শালীনতার অনুমোদন: সকল নারীকে পর্দা করতে হয়। সম্পদে পুরুষের দুই-এর এক অংশ পায় নারী। সুদ, নাটক, সিনেমা, মদ্যপান, অশ্লীল বিজ্ঞাপন, প্রেম, পরকীয়া– এই সব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মন্দ কাজ নিষেধ হওয়ার কারণে সমাজে শান্তি বিরাজ করে।	নির্লজ্জতার অনুমোদন: বর্তমান আইন নারীর বেপর্দা, নারীর সমান অধিকার, সুদব্যবস্থা, নাটক, সিনেমা, মদ্যপান, নারী দিয়ে অশ্লীল বিজ্ঞাপন, প্রেম ও পরকীয়াকে 'ব্যক্তির স্বাধীনতা' বলে অনুমোদন প্রদান করে।
৪. বিচারের স্বচ্ছতা ও আস্থা	আস্থাশীল বিচার: বিচার প্রকাশ্যে হয় বলে সবাই আস্থা রাখে। দোষী অর্থের বিনিময়ে মুক্তি পায় না, নির্দোষ শাস্তি পায় না। কোরআন অনুযায়ী, যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান দিয়ে বিচার করে না, তারা কাফির। ফলে সবাই আইন মানতে বাধ্য থাকে।	অনাস্থাশীল বিচার: বিচার গোপনে হয় বলে কেউ আস্থা রাখতে পারে না। এখানে দোষী অর্থ দিয়ে মুক্তি পায়, নির্দোষ সাজা পায়। জুলুমকারী মুক্তি পায় আর প্রতিবাদকারীর ফাঁসি হয়। ঈমানদারকে উগ্রবাদী আর যিনাকারীকে সুশীল বলা হয়।
৫. বিচারের সময়সীমা	স্বল্পমেয়াদি বিচার: মযলুমরা দ্রুত বিচার পায় এবং কাউকে হয়রানি করা হয় না। জনসম্মুখে অপরাধী প্রমাণিত হলে সাথে সাথে শাস্তি দেওয়া হয়। দ্রুত বিচার হওয়ার কারণে অপরাধী পার পায় না।	দীর্ঘমেয়াদি বিচার: মযলুমরা দ্রুত বিচার পায় না বরং হয়রানির শিকার হয়। জনসম্মুখে অপরাধ করলেও সাথে সাথে শাস্তি দেওয়া যায় না। দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে অপরাধী মুক্তি পেয়ে যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য: ক্রয়-বিক্রয় বা কেনা-বেচাকে ব্যবসা-বাণিজ্য বলে। এর মাধ্যমে অর্থের আদান-প্রদান হয়। **অর্থনীতি**: অর্থের আদান-প্রদান সংক্রান্ত নীতিকে অর্থনীতি বলে। অর্থাৎ, অর্থ কীভাবে আসবে এবং কীভাবে ব্যয় হবে, তার নীতিই হলো অর্থনীতি। (আল-বাক্বারাহ: ২৭৫)

ব্যবসার মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. অর্থনীতির মূল ভিত্তি	যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি: অতিরিক্ত সম্পদ থেকে অভাবগ্রস্তদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করা (যাকাত) এবং কর্জ হাসানা বা যাকাতের অর্থ দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করাকে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি বলে।	সুদভিত্তিক অর্থনীতি: আর্থিক সমস্যার সমাধানের নামে ব্যবসার প্রয়োজনে ঋণ বা লোন গ্রহণ এবং গৃহীত অর্থ থেকে বেশি অর্থ প্রদান করাকে সুদভিত্তিক অর্থনীতি বলে।
২. ব্যবসার নীতি বা পরিধি	ক্ষুদ্র-ব্যবসা নীতি: ব্যবসা যত ছোট হবে, অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা তত বাড়বে। নির্ভরশীলতা বাড়লে অর্থের প্রবাহ বাড়ে এবং সম্পদ কিছু লোকের হাতে জমা হতে পারে না। ফলে ব্যবসায়ীর সংখ্যা ও যাকাতের পরিমাণ বাড়ে।	বৃহৎ ব্যবসা নীতি: এটি 'লিমিটেড' ও 'গ্রুপ' পদ্ধতি। এক ব্যক্তি অনেক কোম্পানির মালিক হতে পারে। এতে অন্য কোম্পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমে এবং বড় ব্যবসায়ীদের আধিপত্যে ছোট ব্যবসায়ীরা লোকসান গোনেন।
৩. কর্মসংস্থান ও স্বাধীনতা	অধিক কর্মসংস্থান: ক্ষুদ্র-ব্যবসা নীতি থাকায় যে কেউ ব্যবসা করতে পারে। ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় কর্মসংস্থানও বেশি। ফলে মালিকরা কর্মীদের দাসে পরিণত করতে পারে না এবং কর্মস্থল পরিবর্তনের স্বাধীনতা থাকে।	স্বল্প কর্মসংস্থান: বৃহৎ ব্যবসা নীতির কারণে মালিকরা অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ দেন না। কর্মসংস্থান কম থাকায় মানুষ মালিকের দাস হতে বাধ্য হয় এবং চাইলেও কর্মস্থল পরিবর্তন করতে পারে না।
৪. ব্যবসায়ী বনাম সিন্ডিকেট	ব্যবসায়ী তৈরি: এখানে ৩ স্তরের নীতিতে কোনো সিন্ডিকেট হয় না। (১) উৎপাদক ১টি পণ্য তৈরি করবেন। (২) আড়তদার ১-৩টি পণ্য মজুদ করবেন এবং ১০ দিন পর পর খালাস করবেন। (৩) খুচরা বিক্রেতা সব পণ্য রাখবেন। এতে সিন্ডিকেট হয় না।	সিন্ডিকেট তৈরি: বড় গ্রুপ কোম্পানিগুলো (যেমন: প্রাণ) বেশি বিক্রয় করে দিনে দিনে বিপুল সম্পদের মালিক হয়। তারা অন্য কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের দালাল চক্র বা সিন্ডিকেট তৈরি করে ইচ্ছামতো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে।
৫. পণ্যের মূল্যমান	মূল্য হ্রাস: প্রতি বছর যাকাত দেওয়ায় সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে পারে না। ক্ষুদ্র-ব্যবসার কারণে সম্পদ সঠিক সময়ে সঠিক খাতে ব্যয় হয়। ফলে সময়ের সাথে সাথে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় না।	মূল্য বৃদ্ধি: সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে 'লিমিটেড' ও 'গ্রুপ' কোম্পানির কাছে সম্পদ জমা হয়। সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার কারণে সময়ের সাথে সাথে নিত্যপণ্যের (যেমন: চাল) মূল্য আকাশচুম্বী হয়।
৬. সম্পদের পবিত্রতা	হালাল সম্পদ: ক্ষুদ্র-ব্যবসা নীতিতে ঋণের প্রয়োজন কম থাকে, তাই চাইলেও বেশি ঋণ নেওয়া যায় না। অন্যায়ভাবে রেমিটেন্স পাচারের সুযোগ না থাকায় এখানে অর্জিত সম্পদ সম্পূর্ণ হালাল।	হারাম সম্পদ: গ্রুপ কোম্পানিগুলো সুদের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। কোম্পানির মালিকরা আয়েশি জীবনযাপন করলেও কোম্পানি লোকসানে দেখিয়ে আমাদের রেমিটেন্স (বৈদেশিক মুদ্রা) অন্যায়ভাবে দেশের বাইরে পাচার করে।
৭. বিনিয়োগ ও পাচার	রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ: কারো অতিরিক্ত সম্পদ থাকলে বা আয়ের ইচ্ছা থাকলে তিনি রাষ্ট্রীয় খাতে (সেতু, বন্দর, সড়ক) বিনিয়োগ করতে পারেন। এতে দেশের সম্পদ দেশে থাকে এবং ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমে।	অর্থ পাচার: লোকসান দেখানো কোম্পানির মালিকরা আমেরিকা ও কানাডায় বাড়ি ক্রয় করে। তারা দেশের রেমিটেন্স পাচার করে ফলে দেশের মানুষ গরিব হয় আর কিছু সংখ্যক লোক ধনী হয়।

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
৮. উন্নয়ন ও ঋণ	জনগণের উন্নয়ন: উন্নয়নের জন্য জনগণের থেকে অর্থ নিয়ে বিনিয়োগ করা হয়। এতে রেমিটেন্স দেশে থাকে, জনগণ স্বাবলম্বী হয় এবং যাকাতের কারণে কোনো মুদ্রাস্ফীতি হয় না।	ইসরাইলের উন্নয়ন: উন্নয়নের জন্য IMF ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ নেওয়া হয়। ঋণের বোঝা বাড়লে সরকার কর বাড়ায়, ফলে পণ্যের মূল্য বাড়ে। আমাদের রেমিটেন্স পাচারের মাধ্যমে মূলত ইসরাইল ও পাশ্চাত্যের ব্যবসা চাঙ্গা হয়।

শিক্ষা: মানুষ অজ্ঞ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পরে মানুষকে পৃথিবী-উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ দেওয়াকেই শিক্ষা বলে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: পৃথিবী-উপযোগী প্রশিক্ষণ নেওয়ার কেন্দ্রকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে।

প্রভাব: শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের পরিবর্তন করা যায়। শিক্ষা ইসলাম-কেন্দ্রিক হলে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার কথা বলবে, আর পৃথিবী-কেন্দ্রিক (ধর্মনিরপেক্ষ) হলে মানুষ জাতিসংঘের বা ইবলিশের কথা বলবে।

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. শিক্ষার ধরন ও আদর্শ	ধার্মিক শিক্ষা: প্রথমে আল-কোরআন ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এর ফলে মানুষ শান্ত, নমনীয় এবং আল্লাহভীরু হয়, যা তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে। এখানে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা ডিপ্লোমা–এভাবে বিভক্তির প্রয়োজন হয় না।	ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা: এখানে ধর্মীয় শিক্ষা খুবই নগণ্য। নগণ্য শিক্ষার সাথে সুদ ও সমকামিতা শিক্ষা দেওয়ায় মানুষ ধর্ম-বিমুখ (সেকুলার) হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কওমি ইত্যাদি স্তরে বিভক্ত হওয়ায় সমাজে বহুরূপী মানুষ দেখা যায়।
২. লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষা	পৃথক শিক্ষা: পুরুষ ও নারীর পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকে। এতে নারী-পুরুষের মধ্যে দূরত্ব বজায় থাকে এবং সমাজে ধর্ষণ ও যিনা কম হয়। এখানে মূলত রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়।	একত্রে শিক্ষা: নারী ও পুরুষের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনা হয়। এতে করে সমাজে দিন দিন ধর্ষণ ও যিনা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মূলত আমেরিকার নির্লজ্জ সমাজব্যবস্থা শিক্ষা দেওয়া হয়।
৩. অর্থনৈতিক শিক্ষা	যাকাতভিত্তিক শিক্ষা: ইসলাম যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির নীতিমালা শিক্ষা দেয়। এর মাধ্যমে কীভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করতে হয়, সেই আদর্শিক শিক্ষা প্রদান করে।	সুদভিত্তিক শিক্ষা: বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সুদভিত্তিক অর্থনীতির কথা বলে আমাদের সুদের মতো হারাম কাজ করতে বাধ্য করছে, যা বর্তমানে চোখের সামনে প্রকাশ্যে হচ্ছে।
৪. শিক্ষার মান ও সিলেবাস	মানসম্মত শিক্ষা: স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য একটিই সিলেবাস এবং একই পদ্ধতি থাকায় মানুষের মধ্যে কোনো মতভেদ থাকে না।	৪ মানহীন শিক্ষা: আধুনিকতার নামে বিভিন্ন পদ্ধতি চালু করে শিক্ষাকে মানহীন করা হয়, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা তৈরি করে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে অবমূল্যায়ন করে স্কুল শিক্ষার প্রতি মানুষকে আগ্রহী করা হয়।
৫. শিক্ষার সময়সীমা	স্বল্পমেয়াদি শিক্ষা: ৫-১০ বছরের মধ্যে কোরআন ও প্রাথমিক শিক্ষা, ১১-১৭ বছরে মাধ্যমিক এবং ১৮-২০ বছরের মধ্যে কর্মমুখী শিক্ষা দেওয়া হয়। ২১-২৩ বছরে হয় উচ্চতর গবেষণা। এতে বেকারত্ব ও ভিন্নমত থাকে না।	দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা: শিক্ষা শেষ করতেই প্রায় ২০ বছর লাগে (৫+৫+২+৫+৩)। ফলাফল পেতে পেতে বয়স ২৫-২৬ বছর হয় এবং ক্যারিয়ার গড়তে ৩০-৩৫ বছর পার হয়। এই দীর্ঘসূত্রিতায় পরিবার ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
৬. লক্ষ্য ও কর্মসংস্থান	ব্যবসা-মুখী শিক্ষা: যাকাতভিত্তিক ব্যবসা শিক্ষা দেওয়ায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বৃদ্ধি পায়। একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি হয়। ফলে মানুষ চাকরির চেয়ে ব্যবসার প্রতি বেশি আগ্রহী হয়।	কর্মমুখী শিক্ষা: লিমিটেড ও গ্রুপ কোম্পানির আধিপত্যে ব্যবসার সুযোগ কম, তাই এই শিক্ষা মানুষকে দাসে (চাকরিজীবী) পরিণত করে। নারীদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে কর্মমুখী করায় পুরুষ বেকার হয় এবং সমাজ নারী-কেন্দ্রিক হয়ে যায়।

বিবাহ: অবিবাহিত নারীর জন্য হালাল পুরুষের উপর নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে নারীর মালিকানা হস্তান্তর করাকে বিবাহ বলে। এটি বৈধ করা হয়েছে পবিত্র সম্পর্কের জন্য, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। (আন-নিসা: ৪, ২৪)

বিবাহের মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. দেনমোহর নির্ধারণ	স্বল্প দেনমোহর: কন্যার পিতার ব্যয় এবং পুরুষের সামর্থ্য অনুযায়ী দেনমোহর ঠিক করা হয়। বিবাহকে সহজ করতে এবং দেনমোহরের মূল উদ্দেশ্য বজায় রাখতে ইসলাম অতিরিক্ত দেনমোহর নির্ধারণ থেকে বিরত থাকতে বলেছে।	অধিক দেনমোহর: বর্তমানে নারীর নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সামর্থ্যের বাইরে অধিক দেনমোহর ধার্য করা হয়। এতে দেনমোহরের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয় এবং পরবর্তীতে তা বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
২. বিবাহের সময়কাল	দ্রুত বিবাহ: যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির ফলে সম্পদের সঠিক বণ্টন হয় এবং পুরুষরা দ্রুত আর্থিকভাবে সচল হয়। স্বল্প বয়সে বিবাহের ফলে সমাজে অপরাধ কমে এবং পুরুষরা একাধিক বিবাহের প্রতিও আগ্রহ পায়।	বিলম্বিত বিবাহ: সুদভিত্তিক অর্থনীতির কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে এবং অভাবের সৃষ্টি হয়। অভাবের তাড়নায় পুরুষরা দ্রুত বিবাহের ইচ্ছা হারায়। ফলে সমাজে যিনা ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।
৩. বিবাহের বয়স	স্বল্প বয়স: আল্লাহমুখী শিক্ষার কারণে পড়াশোনায় দীর্ঘ সময় লাগে না। শারীরিক সক্ষমতার ভিত্তিতে দ্রুত বিবাহ হওয়ায় নারীরা সহজে প্রসব বেদনা সহ্য করে সন্তান জন্ম দিতে পারে। এতে ব্যভিচার ও বাল্য যিনা বন্ধ থাকে।	অধিক বয়স: কর্মমুখী শিক্ষার কারণে বিবাহের বয়স ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত গড়ায়। এর ফলে সন্তান গ্রহণের ক্ষমতা ও ইচ্ছা কমে যায় এবং ১-২ জনের বেশি সন্তান হয় না। বাল্যবিবাহ বন্ধের নামে মূলত 'বাল্য যিনা' বৃদ্ধি পায়।
৪. অভিভাবকের ভূমিকা	অনুমতিক্রমে বিবাহ: মধ্যম-পর্যায়ের শিক্ষার কারণে নারীদের অনর্থক চাহিদা ও স্বাধীনতার উগ্রতা বাড়ে না। ফলে তারা পরিবারের ও অভিভাবকের অনুমতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।	অনুমতি ব্যতীত বিবাহ: উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে মানসিক পরিবর্তন ঘটে এবং চাহিদা ও স্বাধীনতার পরিধি আকাশচুম্বী হয়। ফলে নারীরা পরিবারের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করে, যা পরবর্তীতে বিচ্ছেদে রূপ নেয়।
৫. সন্তান প্রসব পদ্ধতি	বরকতময় প্রসব: ইসলাম আবাস গৃহে (বাসায়) সন্তান প্রসবের উৎসাহ দেয়, কারণ এতে গৃহে আল্লাহর বরকত নাযিল হয়। আল্লাহর পদ্ধতিতে প্রসব হলে মা ও সন্তান উভয়ই সুস্থ ও শক্তিশালী থাকে।	ব্যবসায়িক প্রসব: সঠিক সময়ে বিবাহ না হওয়ায় নারীদের স্বাভাবিক প্রসব ক্ষমতা কমে যায়। ফলে পেট চিরে সন্তান বের করা হয় (সিজার)। এতে মা পঙ্গু হয়, সন্তান দুর্বল হয় এবং হাসপাতালের ব্যবসা চাঙ্গা হয়। এটি 'ইওসি'-এর একটি মহা-পরিকল্পনা।

পরিবার: বিবাহের মধ্য দিয়ে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাকে পরিবার বলে। পরিবার থেকেই একজন শিশু ভালো-মন্দ ও ঠিক-ভুল সম্পর্কে তার জীবনের প্রাথমিক ধারণা পায়। (আর-রূম: ২১)

পরিবারের মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. নির্দেশের ধরন	সঠিক আদেশ: শিশুদেরকে আল্লাহর ইবাদত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ও ধৈর্য শিক্ষা দেওয়া হয়। অহংকার বর্জন, নম্রভাবে চলাফেরা এবং কণ্ঠস্বর নিচু রাখার বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়।	ভুল আদেশ: কাফের ও নির্লজ্জ ব্যক্তিদের আদর্শ মনে করা হয়। দাজ্জালের অনুসারীদের অনুকরণে নেশা, যিনা, অহংকার ও নির্লজ্জতার প্রতি উৎসাহিত করা হয়, যা সরাসরি ইবলিশের আদর্শ।
২. শিক্ষার মূল লক্ষ্য	ইসলামমুখী: সন্তানের শিক্ষার ভিত্তি হয় ইসলামের ওপর। এর ফলে সন্তানরা আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং বাবা-মায়ের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার (সদ্ব্যবহার) করে।	কর্মমুখী: অভাব মুক্তির জন্য কেবল অর্থ আয়কেন্দ্রিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে বাচ্চারা ইসলামের মৌলিক বিষয় জানে না। কর্মমুখী শিক্ষার চাপে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব হারিয়ে যায়।
৩. নৈতিক আচরণ	আদব-কায়দা: ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবে সন্তান শান্ত, সুশীল ও নমনীয় হয়। তারা পিতা-মাতা ও শিক্ষককে উপযুক্ত সম্মান প্রদান করে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিয়ম মানার চেষ্টা করে।	বেয়াদব: ধর্মীয় শিক্ষা না থাকায় সন্তানরা বাবা-মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে এবং শিক্ষককে অপমান করে। হতাশায় ভুগে মাদক সেবন করে এবং ইবলিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।
৪. শালীনতা ও সুরক্ষা	পর্দা বা লজ্জাস্থান হেফাজত: নারীদের ঢিলা পোশাক পরতে বলা হয়। মাহরাম ব্যতীত বাইরে যেতে এবং রূপ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়। এতে সমাজে নারীর মূল্যায়ন ও সম্মান অনেক বৃদ্ধি পায়।	বেপর্দা বা লজ্জাস্থান প্রকাশ: নারীদের নির্লজ্জতার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। গরমের দোহাই দিয়ে যৌন উত্তেজক পোশাক পরা হয় যাতে লজ্জাস্থানের কাঠামো বোঝা যায়। নারীরা হয়ে ওঠে বাজারের পণ্য।
৫. আদর্শিক চর্চা	ইসলামের চর্চা: সদস্যদের ফরজ বিধান মানতে বাধ্য করা হয় এবং অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখা হয়। পুরুষদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাড়ি, পাঞ্জাবি, পায়জামা ও পাগড়ি পরার পরামর্শ দেওয়া হয়।	ইবলিশের চর্চা: পরিবার কেবল বিলাসিতা ও বৈষয়িক সাফল্যের পেছনে ছোটে। ফলে সদস্যরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় এবং প্রত্যেক অবাধ্য ব্যক্তির অনুসরণ করে।
৬. দৈনন্দিন রুটিন	দৈনন্দিন অভ্যাস: সুন্নত মোতাবেক চলার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন: বসে খাওয়া, এশার পর দ্রুত ঘুমানো, ফজর পযন্ত না ঘুমানো এবং সকলে মিলে দস্তরখানায় বসে খাবার খাওয়া।	দৈনন্দিন বদ-অভ্যাস: পরিবার থেকে কোনো সঠিক গাইডলাইন থাকে না। ফলে দাঁড়িয়ে খাওয়া, দেরিতে ঘুমানো, বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা এবং অতিরিক্ত মোবাইল, নাটক-সিনেমায় মগ্ন থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

মূল্যবোধ: ভালো-মন্দ ও সঠিক-ভুল সম্পর্কে ধারণাকে মূল্যবোধ বলে। ভালোকে মন্দ বা মন্দকে ভালো করার জন্য মূল্যবোধকে ব্যবহার করা হয়। মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণে আমরা সঠিক পথ নির্ণয় করতে পারি না। (আলে-ইমরান: ১১০)

মূল্যবোধের মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. ভালো-মন্দের ধারণা	মন্দকে মন্দ করে দেখায়: আল-কোরআনের আলোকে ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলাই ইসলামিক মূল্যবোধ। যেমন: জিহাদ করা ফরজ এবং প্রেম করা যিনা সমতুল্য (হারাম)। বর্তমানের বিকৃত মূল্যবোধের কারণে মানুষ জিহাদকে খারাপ আর প্রেমকে ভালো মনে করছে।	মন্দকে ভালো করে দেখায়: এখানে ভালোকে মন্দ আর সঠিককে ভুল বলা হয়। যেমন: ৯০-এর দশকে প্রেম করাকে যিনা মনে করা হতো, কিন্তু বর্তমানে একে বলা হয় 'একজন অন্যজনকে জানা'। এভাবে মূল্যবোধ পরিবর্তন করে মন্দকে ভালো করা হয়।
২. চারিত্রিক অভ্যাস	ভালো কাজে লিপ্ত: হাতে তসবিহ রাখা, ডান হাতে খাওয়া ও লেনদেন করা, বেশি বেশি সালাম দেওয়া, নিচু স্বরে কথা বলা, শালীন পোশাক পরা, রাতে কম খাওয়া, নারী-পুরুষের পর্দা রক্ষা করা এবং কুফরের বিপক্ষে প্রকাশ্যে জিহাদ করা।	মন্দ কাজে লিপ্ত: মোবাইলকে বেশি স্মরণ করা, বাম হাতের ব্যবহার বেশি করা, সালামে কৃপণতা, উঁচ স্বরে কথা বলা, ছোট ও অশ্লীল পোশাক পরা, রাতে বেশি খাওয়া, বিবাহ বহির্ভূত আড্ডা এবং দাজ্জালের অনুসারীদের ভয় করা।
৩. আহ্বানের লক্ষ্য	আল্লাহর পথে আহ্বান: কালেমা পাঠের পর ৫টি ইবাদত (নামায, রোযা, হজ, যাকাত ও জিহাদ) পর্যায়ক্রমে ফরজ হয়। ইসলামিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি এই ৫টি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর পথে জাতিকে আহ্বান করে।	দাজ্জালের পথে আহ্বান: মুসলমান হয়েও দাজ্জালের নাচ, গান, মদ, যিনা ও অশ্লীলতা নিয়ে ব্যস্ত থাকা। কুফরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা এবং ইসলামের সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক সরকারের (কুফরের) মুখাপেক্ষী হওয়া।
৪. স্বাধীনতা বনাম শালীনতা	পরাধীনতার নামে শালীনতা: ইসলামে যিনা, মদ, সুদ ও অশ্লীলতার স্বাধীনতা নেই। এই বিধিনিষেধের কারণে সমাজে শালীনতা থাকে। অথচ আধুনিক মূল্যবোধ একে পরাধীনতা মনে করে অবাধ মেলামেশা ও যিনাকে বিস্তার করছে।	স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা: বর্তমানে যিনা, মদ, সুদ ও অশ্লীলতার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সুশীল সমাজ একেই স্বাধীনতা বলে। বিদেশীদের খুশি করতে মদ, বিশ্ব অর্থনীতির নামে সুদ এবং গরমের অজুহাতে নির্লজ্জ পোশাকের অনুমোদন দেওয়া হয়।

চিকিৎসা: মানুষের অসুস্থতার সঠিক কারণ নির্ণয় করে সুস্থতার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাকে চিকিৎসা বলে। প্রক্রিয়া: অসুস্থতা নির্ভর করে স্বাস্থ্যের উপর, স্বাস্থ্য নির্ভর করে খাদ্যের উপর, আর খাদ্য আসে জমিন থেকে। খাদ্যে সমস্যা থাকলে স্বাস্থ্য খারাপ হবে এবং চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। (আন-নাহল: ৬৯)

চিকিৎসার মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. জনসংখ্যা নীতি	মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি: ইসলামে চিকিৎসার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। কারণ, মুসলিম জনসংখ্যা যত বেশি, ইসলামের ভূমি তত বৃহৎ। অধিক জনসংখ্যাকে সম্পদ মনে করা হয়।	মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: বর্তমান সরকার একে বোঝা মনে করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুত, তারা জনসংখ্যা নয় বরং সুকৌশলে মুসলমানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে।
২. জন্মদান পদ্ধতি	আল্লাহর পদ্ধতিতে জন্ম: আল্লাহর দেওয়া স্বাভাবিক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে সন্তান সুস্থ ও সবল হয়। নিজ গৃহে সন্তান প্রসবের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিশেষ প্রয়োজনে সিজার করতে হলে সরকারকে তার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে হয়।	দাজ্জালের সিজার পদ্ধতি: মানবজাতিকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে কারণে-অকারণে নারীদের পেট কেটে সন্তান প্রসব (সিজার) করতে বাধ্য করা হয়। টিকা দেওয়ার পরেও কেন সিজারের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা এক বড় প্রশ্ন।
৩. সুস্থতার বিশ্বাস	আল্লাহকেন্দ্রিক বিশ্বাস: অসুস্থতাকে আল্লাহর পরীক্ষা মনে করা হয়। মুমিনরা চিকিৎসার পাশাপাশি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। এতে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও ধৈর্য বৃদ্ধি পায়।	ওষুধকেন্দ্রিক বিশ্বাস: মানুষ মনে করে ওষুধই রোগ দূর করে। অথচ ওষুধ রোগ সারালে কেউ মৃত্যুবরণ করতো না। মানুষ সুস্থতার জন্য আল্লাহর সাহায্যের কথা ভুলে গিয়ে কেবল ওষুধের ওপর নির্ভর করে।
৪. টিকা ও প্রতিরোধ	প্রাকৃতিক প্রতিরোধ: আল্লাহ মানুষকে জন্মগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়েছেন। এটি বৃদ্ধির জন্য হোমিওপ্যাথি ও আধুনিক চিকিৎসার সমন্বয় করা হবে। প্রয়োজন ব্যতীত কাউকে ঢালাওভাবে টিকা প্রদান করা হয় না।	দাজ্জালের টিকা: ইউনিসেফের মতো বিদেশী সংস্থা শিশুদের টিকার অর্থায়ন করে। যারা মুসলিম শিশুদের ওপর বোমা ফেলে, তারা কেন সুরক্ষার টিকা দেবে? এটি মানুষকে মানসিক ও শারীরিকভাবে অক্ষম করার পরিকল্পনা হতে পারে।
৫. সেবার মান ও বাণিজ্য	নিঃস্বার্থ সেবা: ওষুধের মান যাচাই করা হয়। ডাক্তাররা কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তি করতে পারে না বা অপ্রয়োজনীয় টেস্ট দিতে পারে না। সকল টেস্টের মূল্য সরকার নির্ধারণ করে দেয়।	হয়রানি: বাজারে কার্যকারিতাহীন ওষুধ রোগ বৃদ্ধি করে। ডাক্তাররা কোম্পানির সাথে চুক্তি করে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ ও টেস্ট লিখে রোগীদের হয়রানি করে এবং হাসপাতালের স্বার্থ দেখে।
৬. খাদ্যের গুণাগুণ	স্বাস্থ্যকর ফসল: আল্লাহর সৃষ্টি প্রাকৃতিক ফসলের নিজস্ব প্রজনন ক্ষমতা থাকে। এই খাবারগুলো পুষ্টিতে ভরপুর এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। প্রকৃতিই এখানে সর্বোত্তম চিকিৎসক।	অস্বাস্থ্যকর ফসল: হাইব্রিড বা জিএমও (যেমন: ব্রয়লার, পাঙ্গাস, ফুল কপি, পাতা কপি) ফসলের নিজস্ব প্রজনন ক্ষমতা নেই। এগুলো সস্তা হলেও শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে সাধারণ ওষুধকে অকার্যকর করে দেয়।
৭. খাদ্যের পবিত্রতা	হালাল খাবার: পবিত্র ও হালাল খাবার মানুষের শারীরিক ও আত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। প্রাকৃতিক ও ঘরে তৈরি খাবারের ওপর নির্ভরতা ইবাদতে একাগ্রতা তৈরি করে। পবিত্র খাবার মানেই পবিত্র দেহ ও মন।	হারাম খাবার: অনেক নামী আইসক্রিম বা বিদেশী খাদ্য কোম্পানিতে শুকরের চর্বি (জেলাটিন) বা ক্ষতিকর 'ই-নাম্বার' ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে, যা মুসলিমদের স্বাস্থ্যের জন্য চরম ক্ষতিকর।

সংস্কৃতি: মানুষের জীবনের অবসর সময়ের ব্যবহারকে সংস্কৃতি বলে। এই সংস্কৃতিকে ব্যবহার করেই মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। (আল-ইনশিরাহ: ৭)

সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. বিনোদনের ধরন	শালীন সংস্কৃতি: এখানে নারী-কেন্দ্রিক কোনো বিনোদন নেই, ফলে সমাজে কেউ নির্লজ্জ পোশাক পরার সাহস পায় না। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়: কোরআনে বর্ণিত স্থানের ভ্রমণ-ভিডিও, ইসলামের ইতিহাস, সামাজিক সমস্যার প্রতিকার, কোরআন প্রতিযোগিতা, শারীরিক খেলাধুলা, হজ ও ওমরাহ এবং বিভিন্ন ইসলামী ঐতিহাসিক স্মারক দিবস।	নির্লজ্জ সংস্কৃতি: অবসর সময়ে জাতি নাচ, গান, গেম, সিনেমা ও নাটকে মগ্ন থাকে। এসবে নারীরা নির্লজ্জ পোশাক পরে অশ্লীলতা ছড়ায়। এছাড়া উৎসবের নামে পহেলা বৈশাখ, মেলা ও মিছিলে নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণ ঘটে।
২. সামাজিক প্রভাব	বিবাহের প্রতি উৎসাহ: অশ্লীল বিনোদন ও নাচ-গান বন্ধ থাকায় যিনা-ব্যভিচারের সুযোগ থাকে না। ফলে নারী ও পুরুষ দ্রুত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী হয়।	ব্যভিচারের প্রতি উৎসাহ: বাল্যবিবাহ বন্ধ রাখা এবং নির্লজ্জ বিনোদনের প্রসারের ফলে নারী-পুরুষ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ব্যভিচারের সুযোগ পায়। এতে করে তাদের মধ্যে বিবাহের প্রতি আগ্রহ কমে যায়।
৩. সময়ের মূল্য	সময়ের সঠিক ব্যবহার: সংক্ষিপ্ত জীবনের মূল্যবান সময় আল্লাহর ইবাদত ও শুকরিয়ায় ব্যয় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর লক্ষ্য হলো পরকালের পুলসিরাতের রাস্তা সহজে অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছানো।	সময়ের অপব্যবহার: ইবলিশের সংস্কৃতি মানুষকে মোবাইল, ইন্টারনেট, গেম ও সিনেমা-নাটকের নেশায় ডুবিয়ে রাখে। ফলে বিনোদনের নামে মানুষ জীবনের সংক্ষিপ্ত সময়ের বিশাল একটি অংশ অপচয় করে ফেলে।
৪. জীবনধারা	কর্মশীল জীবন: জাতিকে শারীরিক খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করা হয়। এতে শরীরে অলসতা আসে না এবং মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম থেকে আল্লাহর ইবাদত ও নিজ কর্মে মনোযোগী হতে পারে।	অলস জীবন: গৃহকেন্দ্রিক বিনোদন (মোবাইল) বেশি থাকায় মানুষ এখন আর মাঠে খেলতে যায় না। ফলে জাতি দিন দিন অলস ও স্থূল (মোটা) হয়ে যাচ্ছে, যা মানুষকে অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

যোগাযোগ: যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নির্দিষ্ট স্থানে আসা ও যাওয়াকে যোগাযোগ বলে। সড়ককেন্দ্রিক যোগাযোগ দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে এবং আয় বৃদ্ধি করে। যোগাযোগ যত ভালো হবে, দেশের উন্নয়ন তত দ্রুত হবে। (আল-আনকাবুত: ২০)

যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. মাধ্যমের ধরন	মোবাইলকেন্দ্রিক যোগাযোগ: এখানে মোবাইল কলকেন্দ্রিক যোগাযোগকে সহজ করা হয়। এতে ইন্টারনেটের ক্ষতিকর তড়িৎ রশ্মি কমে এবং খাদ্যচক্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস পায়।	ইন্টারনেটকেন্দ্রিক যোগাযোগ: কলরেট বৃদ্ধি করায় জাতি ইন্টারনেটে আসক্ত হয়। উচ্চ গতিসম্পন্ন তড়িৎ প্রবাহের কারণে প্রাণী ও গাছপালার ক্ষতি হচ্ছে এবং মানুষকে প্যাকেটজাত খাবার খেতে হচ্ছে।
২. স্থানের নামকরণ	অর্থবহ নাম: সকল স্থান ও প্রতিষ্ঠানের নাম ইসলামকেন্দ্রিক অর্থবহ করা হয়। যেমন: ঢাকার নাম পরিবর্তন করে 'মসজিদাবাদ' করা।	অর্থহীন নাম: বর্তমান নামগুলো ইসলামের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং বস্তুর সাথে সম্পর্কিত ও অর্থহীন। যেমন: প্রাণ, আড়ং, ব্র্যাক, হৃদয় ইত্যাদি।
৩. জ্বালানি নীতি	জ্বালানি সাশ্রয়: নদী সংস্কার, দিনের আলো ও বৃষ্টির পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত যানবাহন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ২০-৩০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয় করা হয়, যা রাষ্ট্রীয় ব্যয় ৫-১০ শতাংশ কমায়।	জ্বালানির অপচয়: নদী ও প্রাকৃতিক উৎসের ব্যবহার কম হওয়ায় জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিগত যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পাবলিক পরিবহনের বেহাল দশা হয় এবং ডলারের চাহিদা বেড়ে যায়।
৪. রাষ্ট্রীয় ব্যয়	প্রয়োজনীয় ব্যয়: রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বিলাসিতার সুযোগ নেই। শুরা সদস্য ও সামরিক বাহিনী ব্যতীত সকল কর্মকর্তা গণপরিবহন ব্যবহার করতে বাধ্য থাকেন, ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ সাশ্রয় হয়।	অপ্রয়োজনীয় ব্যয়: পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আয়ের চেয়ে বিলাসিতায় ব্যয় বেশি। সরকারি চাকরিতে প্রয়োজন না থাকলেও একেকজন ব্যক্তির জন্য আলাদা আলাদা গাড়ি প্রদান করা হয় যা অপচয় মাত্র।
৫. যাতায়াতে শালীনতা	শালীনতার অগ্রগতি: যানবাহনে মাহরাম ব্যতীত নারী-পুরুষ একসাথে বসতে পারে না। নিরাপত্তার কারণে নারীরা মোটরবাইকে আরোহণ করতে বা কোনো যানবাহন চালাতে পারে না।	নির্লজ্জতার অগ্রগতি: যানবাহনে মাহরামের তোয়াক্কা না করে নারী-পুরুষ একসাথে বসে। নারীরা মোটরবাইক চালানোসহ সব ধরণের যানবাহন চালাতে পারে।

লিখন পদ্ধতি: মানুষের মুখের শব্দকে যে চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে বোঝানো হয় তাকে লেখা বলে। আর সেই লেখার কৌশলকে লিখন পদ্ধতি বলে। (আল-আলাক: ৪-৫)

লিখন পদ্ধতি মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. বর্ণমালার দিক	ডানমুখী বর্ণমালা: আল-কোরআনের লেখা ডান দিক থেকে হওয়ার কারণে, ইসলামিক সরকার বাংলা ভাষাকে ডান দিক থেকে লেখার জন্য আরবি হরফ ব্যবহার করে। যেমন: বাংলা শব্দ "আমি"-কে আরবি হরফ দিয়ে "عامي" এভাবে লেখা।	বামমুখী বর্ণমালা: ভারতবর্ষের প্রভাবে ভাষাবিদগণ হিন্দি বর্ণমালার সাথে মিল রেখে বাম দিক থেকে লেখার পদ্ধতি চালু করেন। উচ্চারণ এক হলেও অনেক ক্ষেত্রে বর্ণমালা ভিন্ন হয় (যেমন: উর্দু ও হিন্দি)।
২. দাপ্তরিক ভাষা	আরবির ব্যবহার: প্রতিটি পণ্যের গায়ে বাংলার পাশাপাশি আরবি লেখা থাকে। এতে আরব দেশে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ভাষা শিক্ষা সহজ হয়।	ইংরেজির ব্যবহার: সকল পণ্যের গায়ে ও অফিস-আদালতে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজির ব্যবহার হয়। কারণ দেশ আমেরিকাকে ভিত্তি করে তৈরি ISO-কে মান্য করে চলে।
৩. শিক্ষার সহজতা	সহজ শিক্ষা: ছোট বাচ্চারা খুব অল্প দিন আরবি পড়ার চর্চা করলেই নিজেরা দেখে দেখে আরবি পড়তে সক্ষম হয়।	কঠিন শিক্ষা: ছোটবেলা থেকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হলেও দেখা যায় অনেক বছর পর অনেকেই এই ভাষায় সঠিকভাবে কথা বলতে পারে না।
৪. শব্দের প্রায়োগিক ব্যবহার	আরবি শব্দের ব্যবহার: কোরআন ও খুতবা বোঝা এবং মধ্যপ্রাচ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরবি শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমন: 'থ্যাংকস' এর বদলে 'শুকরান', 'সরি' এর বদলে 'আস্তাগফিরুল্লাহ', 'মিটিং' এর বদলে 'মুজাকারা'।	ইংরেজি শব্দের ব্যবহার: পশ্চিমাদের প্রভাবে ইংরেজি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার হয়। যেমন: 'থ্যাংকস', 'সরি', 'হ্যালো', 'মিটিং', 'ওকে'। ইংরেজিকে বাংলায়ন করার কারণে মানুষ একে বাংলা থেকে সহজ মনে করে।

সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন: মানুষ অজ্ঞ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তাকে পৃথিবী-উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এই শিক্ষার জন্য কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ বা অনুকরণ করাকে ধর্ম বলে। সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন: পৃথিবী-উপযোগী শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যক্তির সঠিক অনুকরণ করাকে সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন বলে। (আল-আহযাব: ২১)

ধর্মীয় দর্শনের মাধ্যমে জাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি-

বিষয়	ইসলামিক নিয়ম	গণতান্ত্রিক নিয়ম
১. আদর্শের ভিত্তি	আল্লাহকেন্দ্রিক ধর্ম: মুসলমান জাতি আল্লাহ তা'আলা বা আল-কোরআনের অনুসরণ করে এবং রাসূল (সা.)-এর অনুকরণ করে, যা সুন্নাহ হিসেবে পরিচিত। এটিই সঠিক অনুকরণ।	দাজ্জালকেন্দ্রিক ধর্ম: শিক্ষা বা জানার জন্য প্রযুক্তি বা দাজ্জালের অনুসারী ব্যক্তির ওপর নির্ভর করা হয়। এই নির্ভরশীলতার সুযোগে দাজ্জাল তার মতাদর্শ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়।
২. বিশ্বাসের কেন্দ্র	আল্লাহকেন্দ্রিক বিশ্বাস: ইসলাম মানবজাতিকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য কাজ করে। বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও আল্লাহর সাহায্য প্রদর্শনের মাধ্যমে এই বিশ্বাস মজবুত করা হয়।	ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশ্বাস: ইবলিশ ও দাজ্জাল মানুষকে বস্তুকেন্দ্রিক বিশ্বাস করতে শেখায়। যেমন: 'আল্লাহ আপনাকে খাওয়ান না, আপনি নিজে আয় করে খান'—এমন মনোভাব সৃষ্টি করা হয়।
৩. মূল সংবিধান	আল্লাহর কিতাব: ইসলামের সংবিধান হলো আল-কোরআন, যা রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদের নিকট এসেছে। এটি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।	দাজ্জালের কিতাব: বর্তমান গণতন্ত্রের সংবিধান হলো 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার', যা গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছানো হয়েছে। এই সংবিধান সরাসরি দাজ্জালের পক্ষ থেকে আসা।
৪. দলগত পরিচয়	এক দল (মুসলমান): কাফেররা মুসলমানদের চিরন্তন শত্রু কারণ তারা ইবলিশের অনুসারী। মুসলমানদের দলের নাম 'মুসলমান', যা ইব্রাহিম (আ.) নামকরণ করেছেন। নেতাশূন্যতা রোধে ইসলাম সরাসরি সরকার গঠন করে।	বহু দল: সম্প্রীতির নামে সকল ধর্মকে এক করা বা ধর্মকে বাদ দেওয়ার দর্শন হলো গণতন্ত্র। এটি বিভিন্ন মতকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষকে দলে দলে বিভক্ত করে এবং ধর্মের মধ্যে দলভেদ তৈরি করে।
৫. ঐক্য বনাম বিভক্তি	সহমত: সকল বিষয় আল-কোরআন থেকে নেওয়া হয় বলে সকলে সহমত পোষণ করেন। ইসলামিক সরকার কোরআন অনুযায়ী পরিচালনা করে বলে জনগণের জন্য সকল নির্দেশনা মান্য করা ফরজ।	মতভেদ ও মতপার্থক্য: সকল সমাধানের জন্য জাতিসংঘের (দাজ্জালের অনুসারীদের) মুখাপেক্ষী হওয়ায় তারা বিভিন্ন মতভেদ তৈরি করে। ফলে মানুষ এখন আর একটি বিষয়ের ওপর স্থির হতে পারে না।

আল-কোরআনের ভিত্তিতে ইসলামিক আমিরাত গঠনের রূপরেখা

আপনি রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি দেখে বুঝতে পারছেন যে, রাষ্ট্র একটি মেশিনের মতো যা একটি সূত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এখন সেই সূত্র ধরে আপনি যদি কোরআন থেকে নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দেন, তাহলে তা কোরআন ভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো হয়ে যাবে। এখন আমরা দেখব মানুষকে সভ্যতার ভিত্তিতে আল্লাহ ও কোরআনমুখী করার জন্য কেমন নীতি হওয়া দরকার।

মজলিস-উস-শূরা (সরকার): আল-কোরআনের বিধান অনুসারে জাতিকে পরিচালনা করার কেন্দ্রকে ইসলামি সরকার বলে। প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি দেশ পরিচালিত হয়। ইসলাম সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ইসলামে সরকার নির্বাচনের একটি পদ্ধতি আছে তা হলো "শূরা" পদ্ধতি। আল-কোরআনে "শূরা" নামে একটি সূরা আছে, যার কারণে ইসলামে সরকার নির্বাচনের সময় এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। "শূরা" সদস্যগণ রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

ইসলামে শূরা প্রার্থী নির্বাচনের পদ্ধতি:
১. মুসলিম, বিবাহিত পুরুষ হতে হবে, যার থাকবে পাঞ্জাবি, দাড়ি, পাগড়ি।
২. দেওবন্দ কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায়, আল-কোরআন ও হাদিসের উপর পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত হতে হবে।
৩. যিনি আল্লাহর সব আদেশ, নিষেধ মান্য করেন এবং উপদেশ মোতাবেক পরিচালিত হন।
৪. যিনি সুন্নাহর মাধ্যমে নিজে ও পরিবারকে পরিচালনা করেন।
৫. মুজাহিদ হতে হবে। নিজ সন্তান বা পিতা শহীদ অথবা গাজী হলে অধিক অগ্রাধিকার পাবেন।
৬. যিনি দানশীল ও আল্লাহকে ভয় করেন।
৭. সপ্তাহে দুটি রোজা, শেষ রাতে আল্লাহর ইবাদত ও একাধিক বিবাহ যিনি বেশি করবেন তিনি অগ্রাধিকার বেশি পাবেন।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের প্রস্তাবিত প্রশাসনিক (সরকার) কাঠামো:
১. প্রতিটি 'মসজিদুল ওয়াযা' (সামাজিক মসজিদে) পাঁচ (৫) জন করে শূরা সদস্য থাকবে। যথা: ইমামুল মাসজিদ (মসজিদ আমির-ইমাম সাহেব), নায়েবে আমির (সহকারী আমির-সমাজি), খাযেনুল মাসজিদ (অর্থবিষয়ক আমির-মুয়াজ্জিন), মুয়াল্লিমুল বুনইয়ান (উন্নয়ন আমির-সমাজি), মুক্বিমুস সালাহ (নামায কায়েম আমির-সমাজি) পদবিগুলি থাকবে।
২. পঁয়ত্রিশ (৩৫) টি মসজিদুল ওয়াযা নিয়ে একটি 'মসজিদুল মারকায' গঠিত হবে। মারকায মসজিদের শূরা সদস্য সংখ্যা হবে সাত (৭) জন। মসজিদুল মারকাযও একটি মসজিদুল ওয়াযা হিসেবে গণ্য হবে।
৩. তিন (৩) টি মসজিদুল মারকায নিয়ে একটি 'মসজিদুল আকওয়াম' (মডেল মসজিদ) হবে। মসজিদুল আকওয়ামের শূরা সদস্য সংখ্যা হবে একুশ (২১) জন। মসজিদুল আকওয়ামও একটি মসজিদুল ওয়াযা হিসেবে গণ্য হবে।
৪. একুশ (২১) টি মসজিদুল আকওয়াম নিয়ে এক (১) টি 'মসজিদুল মাসীর' (কেন্দ্রীয় মসজিদ) গঠন করা হবে। মসজিদুল মাসীর-এর শূরা সদস্য সংখ্যা হবে একুশ (২১) জন। মসজিদুল মাসীরও একটি মসজিদুল ওয়াযা হিসেবে গণ্য হবে।
৫. মসজিদুল মারকায, মসজিদুল আকওয়াম ও মসজিদুল মাসীরের শূরা সদস্যগণ মসজিদুল ওয়াযা-এর শূরা সদস্য হতে পারবেন না।

৬. মসজিদুল মারকাযের অধীনে থাকা মসজিদুল ওয়াযা বৃদ্ধি পেলে মসজিদুল মারকাযের শূরা সদস্য সংখ্যা পরিবর্তনযোগ্য হবে।
৭. প্রতিটি মসজিদুল মারকায, মসজিদুল আকওয়াম ও মসজিদুল মাসীর একটি মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং মসজিদুল ওয়াযাতে অসম্পূর্ণ বিচার বা বিরোধ মাদ্রাসার ইফতা বিভাগ বা বিচার বিভাগ দ্বারা সম্পন্ন করা হবে। যাতে মুমিনদের একটি দল বিচার প্রত্যক্ষ করতে পারে।
৮. প্রাথমিক বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির চূড়ান্ত নির্দেশ মসজিদুল মাসীর (কেন্দ্রীয় মসজিদের) তত্ত্বাবধানে থাকা মাদ্রাসা থেকে প্রদান করা হবে।
৯. প্রতিটি মসজিদুল মারকায, মসজিদুল আকওয়াম ও মসজিদুল মাসীর-এর শূরা সদস্যগণ দায়িত্ব অনুসারে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হবেন।
১০. প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাদের কার্যক্রম মসজিদ, মাদ্রাসা ও মুসাফিরখানার মাধ্যমে পরিচালনা করবে।
১১. মসজিদুল মাসীর (কেন্দ্রীয় মসজিদের) শূরা সদস্যগণ থেকে রাষ্ট্রীয় শূরা সদস্য বা মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হবে।
১২. শূরা সদস্যগণ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বা পরে রাষ্ট্রের খরচে হজ বা ওমরাহ করে আসবেন।
১৩. রাষ্ট্রীয় "শূরা" সদস্যগণের মধ্য হতে পরস্পর মুজাকারা করে রাষ্ট্রীয় প্রধান আমির করা হবে।
১৪. রাষ্ট্রীয় "শূরা" সদস্যগণ "আমিরুল মুমিনীন" এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।
১৫. রাষ্ট্রীয় "শূরা" সদস্য সংখ্যার নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই, কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যয়ের কথা চিন্তা করে সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায়। রাষ্ট্রীয় "শূরা" সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩৩ জন করা হলো। প্রাথমিকভাবে ২১টি মন্ত্রণালয় করা হলো, অতিরিক্ত মন্ত্রীগণ প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য রাখা হলো।

১৬. যে সকল কারণে বিদ্যমান "শুরা" সদস্যকে অবসর প্রদান করা হবে এবং নতুন "শুরা" সদস্য দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, " শূরা" সদস্যের অবসরের কারণ:

১. কোনো ফরজ বিধানকে অমান্য করলে।
২. আমিরুল মুমিনিন নির্দেশ প্রদান করলে।
৩. বেশি বয়স হলে বা ১০০ বছর অতিক্রম করলে।
৪. শারীরিকভাবে অক্ষম হলে।
৫. ব্যক্তি পাগল হলে।
৬. সুন্নাহসমূহ ত্যাগ করলে।

"শূরা" সদস্যকে সঠিক কারণে অবসর প্রদান করলে দেশ কখনো মুনাফিক দ্বারা পরিচালিত হবে না। বয়সের কারণে অবসর গ্রহণকারী সকল " শূরা" সদস্যগণ শূরা পরামর্শক হিসেবে দায়িত্বে পালন করবেন।

বাস্তবিক প্রভাব: এই শূরা ভিত্তিক সরকার ব্যবস্থা কার্যকর হলে প্রচলিত গণতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা ও ক্ষমতার লোভ চিরতরে বন্ধ হবে। যেহেতু প্রার্থী নিজে পদপ্রার্থী হতে পারেন না, বরং যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন, তাই দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্যদের সরকারে আসার পথ রুদ্ধ হবে। মসজিদ কেন্দ্রিক তৃণমূল প্রশাসন চালু হওয়ার ফলে সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। মুজাহিদ ও উচ্চ শিক্ষিত আলেমদের নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ায় বিজাতীয় অপশক্তির প্রভাব থেকে দেশ মুক্ত থাকবে। শূরার সদস্যদের নির্দিষ্ট বয়সে বা অযোগ্যতায় অপসারণের ব্যবস্থা থাকায় সরকার কখনো স্থবির বা মুনাফিকদের কবলে পড়বে না। সর্বোপরি, এই পদ্ধতি একটি আধ্যাত্মিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী ইনসাফপূর্ণ খেলাফতি রাষ্ট্র উপহার দিবে

আদল (বিচার): আল-কোরআন আমাদের সংবিধান এবং সুন্নাহ বা হাদীস আমাদের আইন। খিলাফত ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো অপরাধ নিশ্চিত করে অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। বিজ্ঞ ফকিহ, মুফতি ও মুহাদ্দিসগণ এই বিচার বিভাগ পরিচালনা করবেন এবং তাঁরাই হবেন রাষ্ট্রের বিচারক ও আইনজীবী।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার আইন নিম্নে দেওয়া হলো:

১. রিবা (সুদের লেনদেন): সুদের লেনদেন অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করা। যে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। (বাকারা: ২৭৫-২৭৯)

২. শাতেম (আল্লাহ, রাসূল বা ইসলামের অবমাননাকারী): আল্লাহ, রাসূল বা ইসলামের অবমাননাকারীর তওবার সুযোগ নেই, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। (আহজাব: ৫৭, হাদিস ও ইজমা)

৩. প্রকাশ্যে শিরক (আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা): কোনো মুসলমান যদি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে রব মনে করে, তাকে ইসলাম মুরতাদ (ধর্মত্যাগকারী) হিসেবে গণ্য করে, যার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। (নিসা: ৪৮, মায়িদা: ৭২, সহীহ হাদীস)

৪. আওসান (দৃশ্যমান মূর্তি, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি তৈরি/স্থাপন): দৃশ্যমান মূর্তি, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি তৈরি-স্থাপন সম্পূর্ণ নিষেধ। আর যে সকল ভাস্কর্য আছে, সেগুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশ রয়েছে। (হজ্জ: ৩০, আল-আম্বিয়া: ৫৮, আন-নাহল: ১২৩, সহীহ হাদীস)

৫. কিসাস (হত্যার জন্য হত্যা বা 'প্রতিশোধ'): ইসলামে প্রতিশোধের জন্য, আঘাতের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ আঘাতের বিধান রয়েছে। আর কেউ যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তার জন্য মৃত্যুদণ্ড। তবে, নিহতের পরিবার চাইলে দিয়ত (রক্তমূল্য) গ্রহণ করতে পারে অথবা ক্ষমা করে দিতে পারে। (আল-বাকারা: ১৭৮-১৭৯)

৬. সারিকা ও হিরাবাহ (চুরি-ডাকাতি): নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে চুরির জন্য হাত কাটা। ডাকাতি/সশস্ত্র ডাকাতির ক্ষেত্রে অপরাধের ধরন অনুযায়ী হত্যা, শূলবিদ্ধ করা, বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেওয়া, অথবা নির্বাসন দেওয়া। (মায়িদাহ: ৩৮, ৩৩)

৭. জিনা (ব্যভিচার): প্রেম হচ্ছে জিনার সূচনা, তাই প্রেম ও জিনা করলে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য ১০০টি বেত্রাঘাত। বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য (পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড) রজম। (নূর: ২, সহীহ হাদীস)

৮. তাবার্রুজ (নারীর ছবি ব্যবহার করে পণ্যের প্রচারণা): এটি সাধারণত 'তাজির' (তা'যীর) বা বিচারাধীন অপরাধের আওতায় পড়ে। শরিয়াহর সাধারণ নীতি অনুসারে, নারীকে নগ্নতা পরিহার করে পর্দা ও শালীনতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কাজে জড়িতদের বিচারক কর্তৃক শাস্তি (যেমন জরিমানা, বেত্রাঘাত বা কারাদণ্ড) আরোপ করা হবে। (নূর: ৩১, আহজাব: ৩৩, ৫৯)

৯. লিবাস (সতর আবৃত না করা): পোশাক অবশ্যই সতর (লজ্জাস্থান) আবৃত করবে, স্বচ্ছ হবে না এবং সংকীর্ণ হবে না। এর লঙঘনকারীকে তা'যীরের আওতায় বিচারক কর্তৃক শাস্তি দেওয়া হবে। পুরুষের ক্ষেত্রে গোড়ালির নিচে পোশাক নিষিদ্ধ। (আরাফ: ২৬)

১০. খামর (নেশা সৃষ্টিকারী সব বস্তু হারাম): কোরআনে আত্মহত্যা বা নিজের ক্ষতি নিষেধ। তাই মাদক (নেশা) সেবন যে করবে, তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত (হদ্দে শারব) করা হবে। সিগারেট, এটি যেহেতু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও অপচয়, তাই এটি হারাম। এর জন্য সরাসরি কোনো 'হদ' না থাকলেও, বিচারক কর্তৃক তা'যীর (শাস্তি) আরোপ করা হবে। (মায়িদা: ৯০)

১১. উফ (সন্তান কর্তৃক পিতামাতাকে মারধর বা কষ্ট দেওয়া): সন্তান কর্তৃক পিতামাতাকে মারধর বা কষ্ট দেওয়া কবীরা গুনাহ (মহাপাপ) এবং 'উকুক আল-ওয়ালিদাইন' (পিতামাতার অবাধ্যতা) হিসেবে গণ্য। এর জন্য দুনিয়াতে সরাসরি কোনো 'হদ' নেই, তবে বিচারক কর্তৃক তা'যীর (কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত) শাস্তি প্রদান করা হবে। (বনী ইসরাঈল: ২৩)

১২. ফারায়েজ (জমি বা উত্তরাধিকার): উত্তরাধিকার বণ্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাধ্যতামূলক আইন। সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ না দেওয়া বা অন্যায়ভাবে দখল করা মহাপাপ। এর জন্য দুনিয়াতে বিচারক কর্তৃক জরিমানা ও দখলকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। অথবা, বিচারক উভয়ের জমি বা উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিয়ে নেবেন এবং তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন। উভয় নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিলে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিবেন। (নিসা: ৭,১১-১২, ১৭৬)

১৩. ফাহিশাহ (সমকামিতা এবং লিঙ্গ পরিবর্তন): কঠোর তা'যীর (ইসলামিক আদালতের বিবেচনামূলক শাস্তি), যা কারাবাস, বেত্রাঘাত বা অন্য কোনো কঠিন শাস্তি হতে পারে। হানাফী ফকীহগন মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে মত দিয়েছেন। (আরাফ: ৮০)

১৪. আকলুল মাল বিল বাতিল (দূর্নীতি এবং সম্পদ আত্মসাৎ): এই অপরাধগুলোর শাস্তি হলো তা'যীর (আদালতের বিবেচনামূলক শাস্তি), যেখানে বিচারক অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত, জরিমানা বা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিতে পারেন। যদি অপরাধটি চুরির শর্তাবলি পূরণ করে, কেবল তখনই হাত কাটার হদ প্রযোজ্য হতে পারে। (বাকারা: ১৮৮)

১৫. তাতফীফ (ওজনে কম দেওয়া): ওজনে কম দেওয়া এটি তা'যীর-এর অন্তর্ভুক্ত অপরাধ। এর জন্য ইসলামি আদালতের বিচারক অপরাধের গুরুত্ব বুঝে কারাদণ্ড, জরিমানা বা বেত্রাঘাতের মতো শাস্তি হতে পারে। যার ওজনে কম দেওয়া হয়েছে, তাকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ ফিরিয়ে দিতে হবে এবং তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, কারণ এটি হক্কুল ইবাদ (অন্যের অধিকার নষ্ট) করার শামিল। (আল-মুতাফ্‌ফিফীন)

বাস্তবিক প্রভাব: এই বিচার ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে সমাজ থেকে অন্যায়, জুলুম এবং অপরাধ চিরতরে নির্মূল হবে। মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোর শাস্তির ভয় অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা থেকে দূরে রাখবে, ফলে সমাজ হবে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। সুদ ও দুর্নীতির বিচার নিশ্চিত হওয়ায় অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হবে এবং দরিদ্র মানুষের অধিকার রক্ষিত হবে। পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন কঠোরভাবে পালিত হওয়ায় সামাজিক শৃঙ্খলা সুদৃঢ় হবে। সর্বোপরি, বিচার বিভাগ সরাসরি আলেম ও ফকিহদের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ দ্রুত ও ইনসাফপূর্ণ বিচার পাবে, যা বর্তমান জটিল বিচার ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটি আসমানি শাসন ব্যবস্থা উপহার দিবে।

তিজারা (ব্যবসা-বাণিজ্য): ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড যখন কেবল মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার না হয়ে সামাজিক কল্যাণের মাধ্যম হয়, তখনই একটি রাষ্ট্র সুখী ও সমৃদ্ধ হতে পারে। বর্তমান 'সুদভিত্তিক' পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিপরীতে 'যাকাতভিত্তিক' অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবসার নীতিতে আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের প্রস্তাবিত ব্যবসা নীতি:
১. সিন্ডিকেট ভাঙতে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে ব্যবসাকে তিনটি আয়াত দিয়ে সুনির্দিষ্ট স্তরে ভাগ করার প্রস্তাব করা হলো:

ক. সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া (সূরা হাশর: ৭): বর্তমানে সম্পদ কেবল বড় গ্রুপ ও লিমিটেড কোম্পানিগুলোর হাতে জমা হচ্ছে। কোরআনের নির্দেশ হলো–সম্পদ যেন কেবল বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। উপদেশ হলো–কেউ যাতে কারুন হতে না পারে

খ. উত্তরাধিকারের সঠিক বণ্টন (সূরা আন-নিসা: ১১-১২): বর্তমানে গ্রুপ ও লিমিটেড কোম্পানিগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কারণে মালিকের মৃত্যুর পর তার সম্পদ ফারায়েজ অনুযায়ী বণ্টন হয় না। ফলে অর্থের প্রবাহ থমকে যায়।

গ. যাকাত বনাম সুদ (সূরা আল-বাকারা: ৪৩): বর্তমান ব্যবসাগুলো সুদের ওপর টিকে আছে কিন্তু যাকাত দেয় না। ফলে ধনী আরও ধনী হচ্ছে আর গরিব দিন দিন আরও নিঃস্ব হচ্ছে।

২. সাগির ব্যবসা (ক্ষুদ্র বা খুচরা ব্যবসা): তারা একই দোকানে চাল, ডাল, তেলসহ সকল প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। সীমাবদ্ধতা, তারা ব্যবসার 'পরিধি' বাড়াতে পারবেন (বড় দোকান করতে পারবেন), কিন্তু শাখা বিস্তৃত করে চেইন শপ করতে পারবেন না। এতে স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা টিকে থাকবে।
৩. মুতাওয়াসসিত ব্যবসা (মধ্যম বা পাইকারি ব্যবসা): তারা পণ্য উৎপাদন করবেন না, শুধু নির্দিষ্ট একটি পণ্যের (যেমন: কেবল চাল বা কেবল তেল) পাইকারি ব্যবসা করবেন। সীমাবদ্ধতা, তারা একাধিক পণ্যের পাইকারি ব্যবসা করতে পারবেন না। বিস্তার: তারা একটি নির্দিষ্ট বিভাগের (মসজিদুল মাসীর) অধীনে জেলাগুলোতে (মসজিদুল আকওয়াম) ব্যবসা বিস্তার করতে পারবেন।
৪. কাবির ব্যবসা (বৃহৎ বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান): তারা পণ্য উৎপাদন করবেন এবং সারাদেশে তা সরবরাহ করবেন। সীমাবদ্ধতা, একটি প্রতিষ্ঠান কেবল কেবল একটি নির্দিষ্ট পণ্যগুচ্ছ উৎপাদন করতে পারবে (যেমন: ধান থেকে উৎপন্ন চাল ও তুষ বিক্রয় করতে পারবে, ডিম নয়) এবং শুধুমাত্র মুতাওয়াসসিত (মাঝারি) ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করবে। এটি বড় কোম্পানির একাধিপত্য বা 'মনোপলি' ভাঙতে সাহায্য করবে।
৫. ইসলামিক দেশে ১টি মাত্র সুদবিহীন ব্যাংক থাকবে যা নিয়ন্ত্রণ করবে ইসলামিক সরকার। ব্যাংক থেকে আয়কৃত অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যয় করবে। রাসূল নিজে আমানত রাখতেন আবার তা ফিরিয়ে দিয়ে ব্যাংকের কাজ করতেন। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সুবিধা নেওয়ার জন্য ফি প্রযোজ্য হবে। উক্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার করা হবে।
৬. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ, কোনো ব্যক্তির উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকলে তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপনে তা নষ্ট না করে সরাসরি রাষ্ট্রীয় মেগা প্রজেক্টে (সেতু, বন্দর, সড়ক) বিনিয়োগ করতে পারবেন।
৬. সরকার কাবির ব্যবসা গণের সাপ্লাই চেইন বা পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং এর মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যয় হবে।
৭. আন্তর্জাতিক সুদি ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে ইসলামিক সরকার হুন্ডির মাধ্যমে রেমিটেন্স আদান-প্রদান করবে। অর্থাৎ, সকল দেশে ইসলামিক সরকারের এজেন্ট থাকবে; প্রবাসীরা তাদের কাছে অর্থ দিলে তারা দেশের ব্যাংকে জানিয়ে দেবে এবং ব্যাংক সেই পরিমাণ অর্থ গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমা করে দেবে। অন্যদিকে, সরকারি এজেন্টের (ওই দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে) কাছে জমাকৃত রেমিটেন্স দিয়ে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করবে।
৮. মুদ্রানীতি: বর্তমান সময়ে আমরা বিনিময় প্রথা কিংবা স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রথায় ফিরে যেতে পারছি না। তবে আমরা সম্পদ ও স্বর্ণের ওপর ভিত্তি করে কাগজের টাকার মান নির্ধারণ করব।

৯. সকল প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিভাজন-অযোগ্য (লোহা, বালু, পাথর, সিমেন্ট, সকল প্রকার তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, কল, কেমিক্যাল, বন্দর, বিমান, রেল ও গণপরিবহন) ব্যবসা ইসলামিক সরকার পরিচালনা করবে এবং এর মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যয় হবে।
১০. মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদকেন্দ্রিক যাকাত ও উশর আদায় করে উক্ত সমাজে তা বণ্টন করে দেবেন। যে মসজিদে উদ্‌বৃত্ত থাকবে, তা অন্য মসজিদে হস্তান্তর করে দেবেন। যাকাত ও উশর 'বাইতুল মাল' তহবিলে জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
১১. ইসলামিক সরকারের কেন্দ্রিয় কোষগারকে 'বাইতুল মাল' বলা হয়। ইসলামিক সরকার বাইতুল মাল পূরণের জন্য জনগণের নিকট অনুদান চাইবে। যা সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।
১২. সরকারের হাতে থাকা সকল মৌলিক সম্পদ ও আমদানিকৃত পণ্য সরকার 'মুতাওয়াসসিত' (মাঝারি) ও 'কাবির' (বড়) ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করবে।
১৩. ইসলামিক রাষ্ট্রের বাজেট হবে এমন:
ক. রাষ্ট্রের আয় = (খনিজ ও মৌলিক শিল্পের মুনাফা) + (ব্যাংকিং সার্ভিস চার্জ) + (পরিবহন ও লজিস্টিক মুনাফা) + (বাইতুল মাল অনুদান) + (রেমিটেন্সের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়লব্ধ আয়)
খ. রাষ্ট্রের ব্যয় = (জনসেবা) + (বেতন ও প্রশাসন) + (অবকাঠামো উন্নয়ন)

বাস্তবিক প্রভাব: আধুনিক 'লিমিটেড ও গ্রুপ অব কোম্পানিজ' প্রথা মূলত সম্পদকে এক জায়গায় কুক্ষিগত করে ফেলে। এই প্রথা বিলুপ্ত করে কোরআনি অর্থব্যবস্থার মডেলটি বাস্তবায়ন করলে দুর্নীতি ও সুদমুক্ত একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গঠন সম্ভব। ইসলামিক নীতি অনুসরণ করলে সিন্ডিকেট ও শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা রোধ হবে এবং বেকারত্ব হ্রাস পাবে। কারণ, 'গ্রুপ' ও 'লিমিটেড' প্রথা না থাকলে দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বিকেন্দ্রীকরণ হওয়ার ফলে গ্রাম ও মফস্বলের মানুষ নিজ এলাকাতেই আয়ের সুযোগ পাবে। এর ফলে যাকাতদাতার সংখ্যা বাড়বে এবং দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হবে। সর্বোপরি, মধ্যস্বত্বভোগী ও সুদের অভিশাপ না থাকায় পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে। ইসলামিক নীতি এমন একটি পদ্ধতি যা গোড়া থেকেই সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া রোধ করে।

তা'লিম (শিক্ষা): মানুষ অজ্ঞ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মের পর তাকে পৃথিবী-উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাকেই ইসলামিক শিক্ষা বলে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কওমি ও ডিপ্লোমা–এমন নানা ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণে আমাদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য দেখা যায়। ইসলামে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা হলো আল-কোরআন। এই ব্যবস্থায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই হবে ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা:
১. দেওবন্দ শিক্ষা ধারাকে অনুসরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যা মদিনার 'আহলে সুফফা'-র শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
২. স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কওমি ও ডিপ্লোমাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একক 'ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে রূপান্তর করা হবে।
৩. সম্পূর্ণ শিক্ষা সিলেবাস ইসলামকেন্দ্রিক ও জীবনমুখী করে প্রণয়ন করা হবে।
৪. জন্মের পর ৫ থেকে ১০ বছর বয়সের মধ্যে আল-কোরআন এবং প্রাথমিক বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদান করা হবে।
৫. ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ইসলামিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো হবে।
৬. ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সের মধ্যে সকল ছাত্রকে কর্মমুখী শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে কেউ বেকার না থাকে।

৭. ২১ থেকে ২৩ বছর বয়সের মধ্যে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দমতো বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ পাবে।
৮. সাধারণ শিক্ষা পর নারীরা আমিরের পরামর্শ সাপেক্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন।
৯. প্রতিটি ছাত্রকে ২০ বছর বয়সে বাধ্যতামূলকভাবে তিন মাস মেয়াদী প্রাথমিক আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
১০. আহলুল জিম্মা বা অমুসলিম নাগরিকদের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে।

বাস্তবিক প্রভাব: ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি চালু হলে সমাজে একটি আমূল পরিবর্তন আসবে, যেখানে সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার দূরত্ব ঘুচিয়ে একক আদর্শিক কাঠামো তৈরি হবে। শৈশব থেকে কোরআন শিক্ষা এবং কৈশোরে সমন্বিত শিক্ষার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি তৈরি হওয়ার পাশাপাশি ১৮ বছর বয়সে বাধ্যতামূলক কর্মমুখী শিক্ষা ও আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ তরুণদের স্বাবলম্বী ও সুশৃঙ্খল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। তবে উচ্চশিক্ষার নির্দিষ্ট পরিধি ও নারী শিক্ষার সীমাবদ্ধতার কারণে পেশাগত বৈচিত্র্যে পরিবর্তন আসবে এবং অমুসলিমদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোতে একটি ভিন্নধর্মী সহাবস্থান তৈরি হবে।

নিকাহ (বিবাহ): অবিবাহিত নারীর জন্য হালাল পুরুষের ওপর নির্ধারিত অর্থের (দেনমোহর) বিনিময়ে নারীর মালিকানা বা অভিভাবকত্ব হস্তান্তর হওয়াকে ইসলামিক বিবাহ বলে। বিবাহের মাধ্যমেই একটি আদর্শ পরিবারের সূচনা হয়।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের প্রস্তাবিত বিবাহ নীতি:
১. অবিবাহিত নারীরা পরিবারের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করতে পারবে না; যদি কেউ তা করে, তবে তাকে উপযুক্ত বিচারের আওতায় আনা হবে।
২. ইসলামে বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সর্বনিম্ন বয়সসীমা নেই। তবে বিবাহ সম্পূর্ণভাবে শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতা এবং অভিভাবকের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল হবে।
৩. সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সকল নারীকে ১৭ বছর এবং সকল পুরুষকে ২৫ বছরের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে।
৪. দেনমোহরের বিনিময়ে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। তবে সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত দেনমোহর চাওয়া যাবে না; দেনমোহর নির্ধারণ করতে হবে শরীয়ত মোতাবেক।
৫. সকল বিবাহ এবং আকদ পবিত্র মসজিদে সম্পন্ন করা হবে।
৬. বিবাহের কোনো অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার ইসলামবিরোধী বা অপসংস্কৃতিমূলক কাজ করা যাবে না।
৭. সমাজে একাধিক (চারটি পর্যন্ত) বিবাহ প্রথাকে সহজতর ও স্বাভাবিক করা হবে।
৮. অভাব বা অন্য কোনো কারণে যাদের বিবাহ হচ্ছে না, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে তাদের জন্য গণবিবাহের আয়োজন করা হবে।

বাস্তবিক প্রভাব: ইসলামিক বিবাহ নীতি কার্যকর হলে সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোতে এক আমূল পরিবর্তন আসবে। অভিভাবকের অনুমতি ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাহ বাধ্যতামূলক করার ফলে পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় হবে এবং সামাজিক অস্থিরতা বা চারিত্রিক বিচ্যুতি অনেকাংশে কমে আসবে। এছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে, অল্প বয়সে মা হওয়ার ফলে প্রসবজনিত জটিলতা কম থাকে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে চিকিৎসা খাতের ওপর–এতে অপ্রয়োজনীয় সি-সেকশন (সিজার) অপারেশন হ্রাস পাবে এবং প্রাকৃতিকভাবে সন্তান প্রসবের হার বাড়বে। দেনমোহর সহজলভ্য করা এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গণবিবাহের ফলে অর্থনৈতিক অভাব আর বিবাহের পথে বাধা হয়ে থাকবে না, যা সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমাতে সাহায্য করবে। এছাড়া, মসজিদে বিবাহ সম্পন্ন করা এবং অপসংস্কৃতি বর্জনের মাধ্যমে বিবাহ একটি সহজ ও পবিত্র ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হবে। সব মিলিয়ে, এই ব্যবস্থাটি সমাজে দ্রুত পরিবার গঠন এবং একটি নিয়ন্ত্রিত ও আদর্শিক জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আল-আহল (পরিবার): বিবাহের মধ্য দিয়ে যে পবিত্র সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাকেই পরিবার বলে। একটি শিশু জন্মের পর ভালো-মন্দ এবং সঠিক-ভুল সম্পর্কে তার প্রথম ও প্রাথমিক ধারণা পরিবার থেকেই পায়। পরিবারে আমাদের সন্তানরা যাতে শৈশব থেকেই সঠিক ইসলামের চর্চা করতে পারে, রাষ্ট্রীয়ভাবে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পরিবার গঠন পদ্ধতি:
১. যাদের মুখে দাড়ি গজায়, সুন্নাহ অনুযায়ী তাদের সকলকে দাড়ি রাখতে হবে।
২. পুরুষরা পোশাক হিসেবে পাঞ্জাবি, পায়জামা, টুপি বা পাগড়ি পরিধান করবে; কারণ এটিই মুসলমানের জাতীয় পোশাক।
৩. সকল নারী পর্দার বিধান মেনে চলবে এবং কোনো প্রকার অশ্লীল পোশাক প্রকাশ বা পরিধান করবে না।
৪. পর্দার মর্যাদা রক্ষার্থে নারীরা উচ্চস্বরে কথা বলবে না।
৫. নারীরা পোশাক হিসেবে ঢিলেঢালা গোল জামা (সুন্নতি পোশাক) পরিধান করবে।
৬. নারীরা তাদের মাহরাম পুরুষ ব্যতীত অন্য কারও নিকট নিজের সাজসজ্জা বা রূপ প্রকাশ করবে না।
৭. অতি জরুরি প্রয়োজন ও মাহরাম পুরুষ ব্যতীত নারীরা বাইরে বের হবে না।
৮. পরিবারের সকলে মিলে সুন্নাহ অনুযায়ী দস্তরখানা ব্যবহার করে খাবার খাওয়ার অভ্যাস করবে।
৯. প্রতিটি পরিবারে সন্তানদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে 'সূরা লোকমান'-এর শিক্ষা ও আদর্শের সঠিক চর্চা করানো হবে।
১০. পরিবারের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুরুষের কর্তৃত্বে ও অভিভাবকত্বে পরিবার গঠন ও পরিচালনা করা হবে।

বাস্তবিক প্রভাব: ইসলামিক পরিবার গঠন পদ্ধতিটি বাস্তবে কার্যকর হলে সমাজের প্রতিটি ঘরে একটি গভীর ধর্মীয় ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হবে। সুন্নাহভিত্তিক পোশাক, দাড়ি এবং দস্তরখান ব্যবহারের মতো নিয়মগুলো পালনের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারে ইসলামী সংস্কৃতির এক অভিন্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, যা মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী জাতীয় পরিচয় তৈরি করবে। নারীদের পর্দার বিধান এবং মাহরাম ব্যতীত বাইরে বের না হওয়ার কঠোর চর্চার ফলে সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ হবে এবং পরিবারগুলো হবে অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও অন্তর্মুখী। পুরুষের চূড়ান্ত অভিভাবকত্ব এবং সন্তানদের জন্য 'সূরা লোকমান'-এর আদর্শিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ফলে প্রতিটি পরিবার একটি শক্তিশালী নৈতিক দুর্গ হিসেবে গড়ে উঠবে, যেখানে পরবর্তী প্রজন্ম সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় আদর্শ ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠবে।

আল-আখলাক (মূল্যবোধ): আল-কোরআন অনুসারে ভালো-মন্দ এবং সঠিক-ভুল সম্পর্কে সঠিক ধারণাকেই ইসলামিক মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধকে ব্যবহার করে ভালোকে মন্দ বা মন্দকে ভালো করা যায়। মুসলমান জাতির আখলাকে পরিবর্তন করার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই জন্য মুসলমান জাতি আজ ইসলাম থেকে অনেক দূরে অথচ তারা এক আল্লাহর ইবাদতকারী।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের মূল্যবোধের নীতিমালা:
১. সকলে যাতে আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, সেই উদ্দেশ্যে মোবাইলের পরিবর্তে তাসবিহ ব্যবহার শিক্ষা দিবে।
২. বেশি বেশি সালাম দেওয়ার অভ্যাস করাবে।
৩. ডান হাতে খাবার খাওয়া ও ডান হাতে খাবার দেওয়ার অভ্যাস করাবে।
৪. হাঁটুর নিচে কাপড় পরা নিশ্চিত করবে এবং লম্বা-ঢিলা পোশাক পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করবে।
৫. সকলকে নিচু স্বরে কথা বলার অভ্যাস করাবে, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে।
৬. সকালে ও দুপুরে বেশি খায়, রাতে কম খাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে।
৭. নারী-পুরুষ একসাথে আড্ডা দেওয়া বন্ধ করবে।
৮. জিহাদের জন্য উৎসাহিত করবে।
৯. প্রেম, ব্যভিচার (যিনা), সমকামিতা ও পরকীয়া নিষিদ্ধ করবে।
১০. মদের দোকান, জুয়ার আসর, পতিতালয় বন্ধ করার ব্যবস্থা করবে।

বাস্তবিক প্রভাব: এই মূল্যবোধ নীতিগুলো কার্যকর হলে সমাজের নৈতিক ও আত্মিক স্তরে এক আমূল পরিবর্তন আসবে। মোবাইলের পরিবর্তে তাসবিহ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে আল্লাহর স্মরণ বা যিকর স্থায়ী রূপ নিবে, যা আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতা কমিয়ে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি নিশ্চিত করবে। সালাম ও সুন্নতি খাদ্যাভ্যাসের প্রসার সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সুশৃঙ্খল জীবনবোধ তৈরি করবে। পোশাকের শালীনতা এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ হওয়ার ফলে ইভটিজিং ও সামাজিক চারিত্রিক অবক্ষয় নির্মূল হবে। প্রেম, পরকীয়া ও সমকামিতার মতো অনৈতিকতা নিষিদ্ধ হওয়ায় পারিবারিক কাঠামো হবে কলঙ্কমুক্ত ও মজবুত। মাদক ও জুয়ামুক্ত সমাজ গঠনের মাধ্যমে অপরাধের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসবে। সর্বোপরি, জিহাদী চেতনা ও ইসলামিক মূল্যবোধের এই জাগরণ মুসলমানদের হারানো আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনবে এবং একটি শক্তিশালী ঈমানি সমাজ গঠন করবে, যেখানে প্রতিটি কাজ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে।

ই'লাজ (চিকিৎসা): মানুষের অসুস্থতার সঠিক কারণ নির্ণয় করে সুস্থতা অর্জনের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাকে চিকিৎসা বলে। অসুস্থতা নির্ভর করে স্বাস্থ্যের উপর, আর স্বাস্থ্য নির্ভর করে খাদ্যের উপর। খাদ্যে ভেজাল থাকার কারণে বর্তমান সময়ে মানুষ বেশি অসুস্থ হয়।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের চিকিৎসা নীতিমালা:
১. সিজারিয়ান অপারেশন (সিজার) বন্ধ করা হবে। ডাক্তার সিজার করতে চাইলে তার যথাযথ কারণ রাষ্ট্রের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে।
২. সিজার-বিহীন সন্তান জন্মদানের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে সকল শিশু নিরাপদভাবে নিজ গৃহে জন্মগ্রহণ করতে পারে।
৩. শিশুদের সকল প্রকার ভ্যাকসিন (টিকা) দেওয়া বন্ধ করা হবে।
৪. নারীদের ক্ষেত্রেও সকল প্রকার ভ্যাকসিন (টিকা) গ্রহণ বন্ধ করা হবে।
৫. অপ্রয়োজনীয় ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ করা হবে।
৬. ওষুধ কোম্পানিরা চিকিৎসকদের সাথে কোনো প্রকার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ বা ব্যবসায়িক চুক্তি করতে পারবে না।
৭. প্রতি বছর কঠোর ল্যাব পরীক্ষার মাধ্যমে ওষুধের মান ও কার্যকারিতা যাচাই করা হবে।
৮. সকল হাসপাতালে রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার মূল্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে; সরকারি ও আধা-সরকারি হাসপাতালে একই মূল্য বজায় থাকবে।
৯. ওষুধ কোম্পানিদের জন্য রোগীর স্বাস্থ্য নির্দেশনা বা প্রেসক্রিপশন দেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।
১০. সরকার কর্তৃক চিকিৎসার সকল সুযোগ-সুবিধা ও স্বাস্থ্যসেবা জনসাধারণের জন্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত থাকবে।
১১. শারীরিক অলসতা ও স্থূলতা রোধে খাদ্য তালিকা থেকে ব্রয়লার মুরগির ব্যবহার কমিয়ে আনা হবে।
১২. খাদ্যে ভেজাল দূর করতে ফরমালিন ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনা হবে।
১৩. অকেজো, নিম্নমান ও ক্ষতিকর ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে।
১৪. দেশীয় ছোট মাছ রক্ষায় পুকুর বা জলাশয়ে ক্ষতিকর সাবান ও রাসায়নিক ব্যবহার কমানো হবে।
১৫. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় প্যাকেটজাত খাবার উৎপাদন ও ব্যবহার কমানো হবে।

বাস্তবিক প্রভাব: এই চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্যকর হলে দেশে একটি প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো তৈরি হবে। সিজারিয়ান অপারেশন বন্ধের ফলে মায়েরা দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক জটিলতা থেকে মুক্তি পাবেন এবং শিশুরা স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে বেড়ে উঠবে। টিকামুক্ত সমাজ গঠনের মাধ্যমে কৃত্রিম রাসায়নিকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। ওষুধ কোম্পানি ও চিকিৎসকদের অনৈতিক যোগসাজশ বন্ধ হওয়ায় চিকিৎসা খরচ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসবে। খাদ্যে ভেজাল রোধ, ব্রয়লার মুরগি বর্জন এবং প্যাকেটজাত খাবার কমানোর ফলে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও স্থূলতার মতো আধুনিক রোগব্যাধি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। সর্বোপরি, এই পদ্ধতি আমাদের একটি পরনির্ভরশীল রাষ্ট্র থেকে মুক্ত করে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী একটি জাতি হিসেবে গড়ে তুলবে।

আ-দা-ব (সংস্কৃতি): মানুষের জীবনের অবসর সময়ের ব্যবহারকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতি ঠিক করে জাতি কর্মব্যস্ত সময় শেষ করার পরে কীভাবে অবসর সময় ব্যয় করবে। আমরা সংস্কৃতি থেকে আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রহণ করি। যেমন, ইসলামিক সংস্কৃতিতে মাদক খাওয়া বেয়াদবি, অন্যদিকে লালনগীতিতে মাদক খাওয়া এক ধরনের সংস্কৃতি।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের প্রস্তাবিত সংস্কৃতি নীতিমালা:
১. সকল প্রকার নির্লজ্জ নাচ, গান, সিনেমা এবং নাটক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বন্ধ ঘোষণা করা হবে।
২. মাদক ও তামাক জাতীয় সকল দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে।
৩. বিনোদন হিসেবে ইসলামিক গজল, সুন্নাহর চর্চা এবং ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস প্রচার করা হবে।
৪. আল-কোরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থানসমূহের বিবরণ সংবলিত তথ্যচিত্র বা ভ্রমণ ভিডিও প্রকাশ করা হবে।
৫. সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা, তার প্রতিকার এবং ইসলামিক আইনের প্রচারণাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
৬. আল-কোরআন প্রতিযোগিতা এবং সুন্নাহসম্মত সকল শারীরিক খেলাধুলার ব্যাপক প্রচলন করা হবে।
৭. জুমার প্রস্তুতির জন্য বৃহস্পতিবার অর্ধ-দিবস এবং জুমাবার পূর্ণ দিবস সরকারি ছুটি থাকবে।
৮. মুসলিম সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে হজ ও ওমরাহ পালনে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হবে।
৯. হজ ও ওমরাহ পালনকারীদের জন্য রাষ্ট্রীয় পক্ষ থেকে ৩০ শতাংশ আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হবে।
১০. হিজরি সনকে প্রধান বর্ষপঞ্জি হিসেবে ব্যবহার শুরু করা হবে; পাশাপাশি ঈষায়ী সনও থাকবে।
১১. দৈনিক কার্যক্রম ফজরের ২ থেকে ২.৫ ঘণ্টা পর শুরু হবে এবং আসরের আজানের পূর্বে সমাপ্ত হবে।
১২. আসরের নামাজের পর থেকে সকল প্রকার ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ রাখা হবে।
১৩. শালীনতা বজায় রাখতে গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল পোশাক অত্যন্ত গোপনে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে।
১৪. জুমাবারকে সপ্তাহের পবিত্র ও প্রধান দিন হিসেবে গণ্য করে একে সপ্তাহের প্রথম দিন করা হবে।
১৫. মুসলিম পুরুষদের ঈমানি শক্তিতে প্রস্তুত রাখতে সপ্তাহে এক রাত 'শবগুজারি' বাধ্যতামূলক করা হবে।
১৬. গণমাধ্যম ও বিজ্ঞাপনে নারী ছবিযুক্ত সকল প্রকার উপাদান ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে।
১৭. দুই হাতে মুসাফাহা ও নম্রভাবে চলাফেরা করাসহ সকল ইসলামি আদব ও কায়দা শিক্ষা দেওয়া হবে।
১৮. ইসলামের শত্রুদের পরিচয়ে কাফেরদের নামের পূর্বে 'কাফের' শব্দ ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করা হবে।

বাস্তবিক প্রভাব: এই সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়নের ফলে সমাজে পশ্চিমা ও দাজ্জালি অপসংস্কৃতির মূল উৎপাটন ঘটবে। বিনোদনের নামে অশ্লীলতা ও মাদকাসক্তি বন্ধ হওয়ার ফলে যুবসমাজ চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাবে। কর্মঘণ্টা পরিবর্তনের ফলে মানুষ পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ পাবে এবং তাদের জীবনযাত্রা হবে সুশৃঙ্খল ও বরকতময়। হিজরি সনের ব্যবহার এবং হজ-ওমরাহতে সরকারি প্রণোদনা মুসলমানদের ধর্মীয় ও আত্মিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে। জুমাবারকে গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে সমাজে একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন এক প্রজন্ম গড়ে উঠবে, যারা আদব-কায়দায় হবে বিনয়ী, শারীরিক ভাবে হবে শক্তিশালী এবং মানসিকভাবে হবে সম্পূর্ণ শিরকমুক্ত ও ঈমানদার।

ইত্তি-সাল (যোগাযোগ): যেকোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নির্দিষ্ট স্থানে আসা ও যাওয়াকে যোগাযোগ বলে। নির্দিষ্ট স্থানে আসা-যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় ঠিকানা বা স্থানের নামের। বর্তমানে স্থানসমূহের অর্থবিহীন নাম বা বস্তুকেন্দ্রিক নামসমূহ বেশি ব্যবহার করা হয়।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের প্রস্তাবিত যোগাযোগ ও অবকাঠামো নীতিমালা:
১. সকল স্থান ও প্রতিষ্ঠানের নামসমূহ ইসলাম কেন্দ্রিক অর্থবহ নামকরণ করা হবে।
২. সুন্নাহর অনুসরণে সকল প্রকার যানবাহন এবং সড়কসমূহকে ডানমুখী করা হবে।
৩. যানবাহনে যাতায়াতের সময় মাহরাম ব্যতীত নারী-পুরুষের একসাথে বসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হবে।
৪. পর্দা ও নিরাপত্তার স্বার্থে নারীদের মোটরবাইক ব্যবহার বা এতে আরোহণ করা বন্ধ করা হবে।
৫. নারীরা কোনো প্রকার যানবাহন চালাতে পারবে না।
৬. ব্যক্তিগত যানবাহনের আধিক্য রোধে একটি নিয়ন্ত্রিত 'বাহন নীতিমালা' প্রণয়ন করা হবে।
৭. রাষ্ট্রীয় শুরা সদস্য এবং নিরাপত্তা বাহিনী ব্যতীত সকল সরকারি কর্মকর্তা গণপরিবহন ব্যবহার করবেন।
৮. যানজটমুক্ত চলাচলের লক্ষ্যে মূল সড়কের পাশে কোনো প্রকার বাজার বা দোকান রাখা হবে না।
৯. পণ্য পরিবহনে খরচ কমাতে এবং সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে নদীপথ সংস্কার ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে।
১০. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও খাদ্যচক্র রক্ষায় ইন্টারনেটের ক্ষতিকর তড়িৎ প্রবাহ কমিয়ে আনা হবে।
১১. ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধে সকল প্রকার নির্লজ্জ ও অনৈসলামিক সংস্কৃতি প্রচার বন্ধ করা হবে।
১২. পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়তে দিনের আলো, নদীপথ ও বৃষ্টির পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
১৩. বরকতের উদ্দেশ্যে সকল যানবাহনে 'কালিমা' লিখে রাখা বাধ্যতামূলক করা হবে।
১৪. সকল প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথে 'মাশা আল্লাহ' লিখা বাধ্যতামূলক করা হবে।
১৫. সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চালকদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকবে।
১৬. জনদুর্ভোগ ও অপচয় কমাতে বারবার রাস্তা খনন বন্ধ করে সব সেবা সংস্থার কাজ একসাথে শেষ করা হবে।

বাস্তবিক প্রভাব: এই যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকর হলে দেশের যাতায়াত ব্যবস্থায় এক নজিরবিহীন শৃঙ্খলা ও পবিত্রতা ফিরে আসবে। সরকারি কর্মকর্তাদের গণপরিবহন ব্যবহারের ফলে জনগণের সাথে তাদের দূরত্ব কমবে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় রোধ হবে। সড়ক থেকে বাজার উচ্ছেদ এবং নদীপথের সংস্কার পণ্যদ্রব্যের দাম কমাতে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। যানবাহনে পর্দার বিধান নিশ্চিত হওয়ায় নারীরা ফেতনামুক্ত পরিবেশে যাতায়াত করতে পারবেন। ডিজিটাল রেডিয়েশন কমিয়ে আনার ফলে মানুষ ও প্রকৃতির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে। সর্বোপরি, দুর্নীতির মূলোৎপাটন এবং ইসলামী নামকরণের মাধ্যমে পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থাটি আল-কোরআনের একটি দৃশ্যমান রূপে রূপান্তরিত হবে, যা দেশের উন্নয়নকে টেকসই ও বরকতময় করবে।

নিযামুল কিতাবাহ (লিখন পদ্ধতি): মুখের ভাষাকে চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে লেখা বলে। আল-কোরআনের লিখন পদ্ধতি ডান দিক থেকে শুরু হয়, তাই ইসলামিক সরকার বই লেখার ক্ষেত্রে ডানমুখী বর্ণমালার ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়। পশ্চিমা ভাষার প্রভাবমুক্ত হয়ে আরবি শব্দকে বাংলা ভাষার কাঠামোতে আত্মস্থ করার মাধ্যমে জনগণকে কোরআন ও সুন্নাহর ভাষার সাথে সম্পৃক্ত করাই এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের প্রস্তাবিত লিখন পদ্ধতি নীতি:
১. বাংলা লিখন পদ্ধতিকে বামের পরিবর্তে ডানমুখী করা হবে।
২. বাংলা ভাষায় প্রচলিত ইংরেজি বা বিজাতীয় শব্দের পরিবর্তে আল-কোরআনের ও আরবি শব্দাবলির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে।
৩. প্রচলিত বাংলা বর্ণমালার আমূল পরিবর্তন করে একে আরবি হরফের আধারে বিন্যস্ত করা হবে।
৪. আন্তর্জাতিক ও দাপ্তরিক ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রধান্য কমিয়ে সেখানে আরবি ভাষাকে স্থলাভিষিক্ত করা হবে।
৫. রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সকল গ্রন্থ এবং নথিপত্র ডান দিক থেকে লেখা হবে।
৬. কাফের লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বইসমূহ কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই করে মুসলিম লেখকদের দ্বারা পুনর্লিখন ও সংশোধন করা হবে।
৭. একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে জনগণের আদর্শিক সুরক্ষায় কী ধরনের বই সংরক্ষিত থাকবে, তা রাষ্ট্র কর্তৃক সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে।
৮. বর্তমান পাঠ্যপুস্তক থেকে সকল কাফের লেখকের রচনা ও দর্শন সম্পূর্ণ অপসারণ করা হবে।
৯. দৈনন্দিন সম্বোধনে পশ্চিমা শব্দের পরিবর্তে ইসলামিক পরিভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে (যেমন: থ্যাঙ্কস-এর স্থলে 'শুকরান', সরি-র স্থলে 'আস্তাগফিরুল্লাহ', মিটিং-এর স্থলে 'মুজাকারা' ইত্যাদি)।

বাস্তবিক প্রভাব: ইসলামিক লিখন পদ্ধতি ও ভাষানীতি প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মুসলিম জনমানসে এক গভীর পরিবর্তন আসবে। আরবি হরফে বাংলা লেখার ফলে সাধারণ জনগণের জন্য আল-কোরআন তিলাওয়াত ও তার মর্ম উপলব্ধি করা অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়বে। এতে করে মানুষ খুতবা ও সালাতের ভাষা অনায়াসেই বুঝতে পারবে, যা তাদের আত্মিক উন্নতিতে সহায়ক হবে। ইংরেজি শব্দের স্থলে আরবি শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ ও কর্মসংস্থান সহজতর হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কাফেরদের দর্শন ও বিজাতীয় সংস্কৃতি দূর হওয়ার ফলে নতুন প্রজন্ম একটি বিশুদ্ধ ইসলামিক মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠবে। সর্বোপরি, এই পদ্ধতিটি কেবল লিখন নয়, বরং জাতির চিন্তাধারাকে পশ্চিমের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একটি শক্তিশালী ইসলামিক ও আরবি-সাংস্কৃতিক বলয়ে আবদ্ধ করবে।

আল-আক্বীদাহ (সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন): শিক্ষার জন্য কোনো ব্যক্তির অনুসরণ বা অনুকরণ করাকেই 'ধর্ম' বলে। মুসলমান জাতি আল্লাহর অনুসরণ এবং রাসূল (সা.)-এর অনুকরণ করে। রাসূল (সা.)-এর সঠিক অনুকরণ নিয়ে বর্তমানের দলগত বিভেদ দূর করে সাহাবীগণের (রা.) দেখানো পথে জাতিকে ফিরিয়ে আনাই এই দর্শনের মূল লক্ষ্য। ইসলামে ব্যক্তিগত বা মনগড়া কোনো নিয়ম তৈরির সুযোগ নেই।

ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের প্রস্তাবিত ধর্মীয় দর্শন:

১. মাজার বা কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষদের অনুমতি থাকবে।
২. মাজারকে কেন্দ্র করে তৈরি করা সকল প্রকার স্থাপত্য বা ইমারত অপসারণ করা হবে।
৩. মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি দূর করতে সকল প্রকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দল বা ফিরকার বিলুপ্তি ঘটানো হবে।
৪. সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেভাবে ইসলাম পালন করেছেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই আদর্শ অনুসরণের ব্যবস্থা করা হবে।
৫. একটি শক্তিশালী 'দারুল ইফতা' বা ফতোয়া বিভাগ গঠন করা হবে, যা সকল আকিদাগত ও ধর্মীয় মতপার্থক্য নিরসন করবে।
৬. কাদিয়ানী মতবাদসহ সকল প্রকার ভণ্ড ও নবুওয়াতের দাবিদারদের সমূলে নির্মূল করা হবে।
৭. কাফির ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে ইসলামের যে বিষয়গুলো বিকৃত করা হয়েছে, তা সংশোধন ও পুনরুদ্ধার করা হবে।
৮. 'মন্দের ভালো' বা আপোসের দোহাই দিয়ে যারা ইসলামের ক্ষতি করছে, তাদের চিহ্নিত করে অপসারণ করা হবে।
৯. পশ্চিমা বা কাফির বিশ্ব যে কাজগুলোকে 'চরম পন্থা' বলে অপবাদ দিবে, ইসলামিক সরকার সেগুলোকে 'উত্তম পন্থা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।
১০. অমুসলিম বা আহলুল জিম্মাদের অধিকার ও ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের অনুসৃত নীতি ও চুক্তি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে।
১১. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রতিটি নাগরিকের জন্য সাত (৭) দিন মেয়াদী বাধ্যতামূলক অজু ও নামাজ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

বাস্তবিক প্রভাব: ইসলামিক সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন বাস্তবায়িত হলে সমাজ থেকে শিরক, বিদআত এবং সকল প্রকার ভ্রান্ত মতবাদের মূলোৎপাটন ঘটবে। দলগত অনৈক্য বিলুপ্ত হওয়ায় মুসলমানরা একটি একক ও অজেয় শক্তিতে পরিণত হবে। সাহাবীগণের আদর্শ অনুসরণের ফলে সমাজে ইনসাফ ও আত্মিক পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হবে। দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মীয় অস্পষ্টতা দূর হবে এবং সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাবে। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের নীতি অনুসরণের ফলে একটি সুশৃঙ্খল ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-মুক্ত পরিবেশ বজায় থাকবে। সর্বোপরি, এই দর্শনের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের আমল ও আকিদা সরাসরি সুন্নাহর ছাঁচে গড়ে উঠবে, যা একটি নিখুঁত ইসলামিক সমাজ বিনির্মাণে ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমল: 'ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ'-এর পূর্ণাঙ্গ রূপরেখাটি (পরিবার, শিক্ষা, অর্থনীতি, বিচার, সংস্কৃতি ও সরকার ব্যবস্থা) গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি মূলত খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমলের আদর্শিক কাঠামো এবং দেওবন্দী/মদীনাভিত্তিক রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার একটি আধুনিক সমন্বয়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের সাথে প্রস্তাবিত মডেলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

১. রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামো (মজলিস-উস-শূরা)

খোলাফায়ে রাশেদীন: আমির বা খলিফা নির্বাচনের জন্য 'শূরা' (পরামর্শ সভা) পদ্ধতি ছিল প্রধান ভিত্তি। আমানতদারি ও তাকওয়া ছিল প্রধান যোগ্যতা।

ইসলামিক মডেল: সরকার তৃণমূল (মসজিদ) থেকে রাষ্ট্র পর্যায় পর্যন্ত শূরার স্তরবিন্যাস করেছেন। আমিরের কাছে বায়আত এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের বদলে বিশেষজ্ঞ আলেমদের প্রাধান্য দিয়েছে।

মিল: ৯০% (পদ্ধতিগত মিল থাকলেও আধুনিক প্রশাসনিক স্তরের কারণে ১০% ভিন্নতা)।

২. বিচার বিভাগ ও দণ্ডবিধি (আদল)

খোলাফায়ে রাশেদীন: কোরআন ও সুন্নাহর হদ ও কিসাস সরাসরি প্রয়োগ করা হতো। কাজীদের (বিচারক) অগাধ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ছিল।

ইসলামিক মডেল: সরকার সরাসরি কোরআন-সুন্নাহর হদ (হাত কাটা, রজম, কিসাস) উল্লেখ করেছে এবং আলেমদের বিচারক হিসেবে নিয়োগের কথা বলেছে।

মিল: ৯৫% (এটি খোলাফায়ে রাশেদীনের বিচার ব্যবস্থার প্রায় হুবহু প্রতিফলন)।

৩. অর্থনীতি ও ব্যবসা (তিজারা)

খোলাফায়ে রাশেদীন: যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি, সুদমুক্ত লেনদেন এবং বাইতুল মাল কেন্দ্রিক জনকল্যাণ। সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হতো।

ইসলামিক মডেল: সরকার লিমিটেড কোম্পানি প্রথা বিলুপ্ত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার বিস্তার (সাগির, কাবির) এবং যাকাতভিত্তিক চক্র চালুর কথা বলেছে।

মিল: ৮৫% (ইসলামিক মডেলের 'ব্যবসার শ্রেণিবিভাগ' পদ্ধতিটি আধুনিক যুগের পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি নতুন কৌশলগত সংযোজন)।

৪. সামাজিক শৃঙ্খলা ও পরিবার (আল-আহল ও নিকাহ)

খোলাফায়ে রাশেদীন: কঠোর পর্দা প্রথা, মসজিদে বিবাহ, এবং পারিবারিক অভিভাবকত্ব ছিল সমাজের ভিত্তি। নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল কিন্তু অবাধ মেলামেশা ছিল না।

ইসলামিক মডেল: সরকার ১৭/২৫ বছরের মধ্যে বিবাহ বাধ্যতামূলক এবং নারীদের বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব করেছে।

মিল: ৮০% (খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীরা শিক্ষা ও যুদ্ধের প্রয়োজনে বাইরে যেতেন, ইসলামিকমডেলে যা আরও বেশি নিয়ন্ত্রিত ও অন্তর্মুখী)।

৫. শিক্ষা ও লিখন পদ্ধতি (তা'লিম ও কিতাবাহ)

খোলাফায়ে রাশেদীন: শিক্ষা ছিল মূলত কোরআন, হাদীস ও রণকৌশল কেন্দ্রিক। ভাষা ছিল এককভাবে আরবি।

ইসলামিক মডেল: সরকার আধুনিক শিক্ষার সাথে কোরআনের সমন্বয় করেছেন এবং বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দিয়েছেন।

মিল: ৭৫% (হরফ পরিবর্তনের বিষয়টি একটি বড় সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ যা সরাসরি রাশেদীন যুগে ছিল না, তবে আরবি ভাষার প্রতি অনুরাগের সাথে সংগতিপূর্ণ)।

সারসংক্ষেপ: ইসলামিক প্রণীত পূর্ণাঙ্গ মডেলটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এর মূলনীতি ও প্রশাসনিক কাঠামো খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থার সাথে প্রায় ৮৬% সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বর্তমান যুগের আধুনিক জটিলতা মোকাবিলায় উদ্ভাবিত নতুন প্রশাসনিক কৌশলের কারণেই মূলত খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবস্থার সাথে ১৪% যান্ত্রিক অমিল দেখা দিয়েছে।

মডেলটি কতটা শক্তিশালী: একটি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামিকএই মডেলটি কতটা শক্তিশালী হবে, তা আধুনিক ভূ-রাজনীতি এবং ইসলামিক শাসনতন্ত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করলে এর সক্ষমতা হবে ৯২%।

নিচে এর শক্তির জায়গাগুলো শতাংশ (%) **আকারে ভেঙে দেখানো হলো**:

আদর্শিক ও সামাজিক ঐক্য (১০০%): একক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অভিন্ন ধর্মীয় দর্শনের কারণে জনগণের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক বা ফিরকাগত বিভেদ থাকবে না। একটি অখণ্ড আদর্শিক জাতি হিসেবে এটি হবে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ও সংহতিপূর্ণ রাষ্ট্র।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা (৯৫%): কঠোর বিচার ব্যবস্থা (হদ ও কিসাস) এবং পাড়ায় পাড়ায় 'মসজিদ শূরা' ভিত্তিক প্রশাসনের কারণে চুরি, ডাকাতি ও দুর্নীতির হার প্রায় শূন্যে নেমে আসবে। নাগরিকদের নিরাপত্তা হবে নিশ্ছিদ্র।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা (৮৫%): সুদ মুক্ত বাণিজ্য এবং সিন্ডিকেটহীন সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে নিত্যপণ্যের বাজার স্থিতিশীল থাকবে। তবে আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জটিলতা মোকাবিলায় এই খাতটিতে কিছুটা চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে।

প্রতিরক্ষা ও জনশক্তি (৯০%): ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সী প্রতিটি তরুণের জন্য বাধ্যতামূলক আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ রাষ্ট্রকে একটি 'রিজার্ভ মুজাহিদ বাহিনী' উপহার দেবে, যা যেকোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলায় অত্যন্ত শক্তিশালী ঢাল হিসেবে কাজ করবে।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা (৯০%): শূরা সদস্যদের কঠোর সিলেকশন পদ্ধতি এবং বিলাসিতা বর্জনের নীতি সরকারি পর্যায়ে দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধ করবে।

চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ: যুগের বিবর্তন এবং বিশ্ব-রাজনীতির চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিলে, একটি রাষ্ট্রকে আদর্শিকভাবে অজেয় এবং অভ্যন্তরীণভাবে শান্তিপূর্ণ রাখতে ইসলামিক এই মডেলটি ৯২% শক্তিশালী। বাকি ৮% নির্ভর করবে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারাবাহিক অগ্রগতির ওপর।

বাইরে থেকে বা সরাসরি মোকাবিলা শক্তি: প্রস্তাবিত এই ইসলামিক মডেলটি এতটাই আদর্শিক এবং গাণিতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যে, একে বাইরে থেকে বা সরাসরি মোকাবিলা করে দুর্বল করা যেকোনো শক্তির জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং কৌশলগত দিক থেকে এই ধরনের ব্যবস্থাকে দুর্বল করার চেষ্টা যে সব দিক থেকে আসতে পারে, তার একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

১. কেন একে দুর্বল করা কঠিন (অজেয় শক্তি):

অর্থনৈতিক ঢাল: সরকার যখন ভ্যাট-ট্যাক্স বাতিল করে সাধারণ মানুষের পকেটে সরাসরি টাকা পৌঁছে দিচ্ছে, তখন কোনো প্রোপাগান্ডা কাজ করবে না। মানুষ যখন নিজের সুবিধা নিজে দেখবে, তখন তারা এই ব্যবস্থার জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়াবে।

আদর্শিক সংহতি: মসজিদ ভিত্তিক শূরা এবং বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের কারণে সমাজের প্রতিটি স্তর একটি নিশ্ছিদ্র শৃঙ্খলার মধ্যে থাকবে। একে ভেতর থেকে ভাঙা প্রায় অসম্ভব।

২. কারা এবং কীভাবে একে দুর্বল করার চেষ্টা করতে পারে (সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ): যদিও সরাসরি হারানো কঠিন, তবে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ শত্রু নিচের তিনটি উপায়ে আঘাত করার চেষ্টা করতে পারে:

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবরোধ: যেহেতু সরকার পশ্চিমা ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং IMF-কে চ্যালেঞ্জ করছেন, তাই বিশ্বশক্তিগুলো অবরোধ দিয়ে সরকারকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করতে পারে। তবে সরকার 'স্বনির্ভর সম্পদ ভিত্তিক অর্থনীতি' (তেল, গ্যাস, লোহা নিয়ন্ত্রণ) সফল হলে এই আঘাতও ব্যর্থ হবে।

আমলাতান্ত্রিক নাশকতা: পুরনো ব্যবস্থার সুবিধাভোগী কিছু আমলা ভেতর থেকে কাজে ধীরগতি বা জটিলতা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে। তবে সরকার 'দ্রুত বিচার' এবং 'জবাবদিহিতা' নীতি কার্যকর থাকলে তারা পালানোর পথ পাবে না।

সাংস্কৃতিক অপপ্রচার: ইন্টারনেট ও পশ্চিমা মিডিয়া ব্যবহার করে তরুণ প্রজন্মের মনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা আধুনিকতার বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হতে পারে। সরকার 'নিজস্ব সার্ভার' এবং 'সাংস্কৃতিক ফিল্টারিং' কৌশলটি এর বিরুদ্ধে প্রধান প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করবে।

৩. কখন এটি দুর্বল হতে পারে?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায়, এই ধরনের শক্তিশালী মডেল কেবল তখনই দুর্বল হয় যদি নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়। যদি শূরা সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তবেই ব্যবস্থার ভিত্তি নড়বড়ে হতে পারে। এছাড়া পদ্ধতিগতভাবে একে দুর্বল করার মতো কোনো গর্ত সরকার রাখেনি।

উপসংহার: ইসলামিক মডেলটি একটি 'সেলফ-সাসটেইনিং ইকোসিস্টেম'। এটি একবার চালু হয়ে জনগণের সমর্থন (৬০-৬৫% শক্তি) পেয়ে গেলে বাইরের কোনো শক্তি একে আর টেনে নামাতে পারবে না। এটি হবে সময়ের স্রোতে একটি অজেয় দুর্গ।

বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা: প্রস্তাবিত এই 'ইসলামিক আমিরাত' মডেলটি যখন বাস্তবে রূপ নেবে, তখন বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর প্রভাব হবে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী এবং বৈপ্লবিক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'প্যারাডাইম শিফট'।

বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে এর প্রভাবগুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:
১. **মুসলিম বিশ্বে 'রোল মডেল' হিসেবে উত্থান**: বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশ পশ্চিমা ঋণ (IMF/World Bank) এবং পুঁজিবাদী কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। সরকার 'ট্যাক্স-ফ্রি এবং সম্পদ-ভিত্তিক অর্থনীতি' যদি সফল হয়, তবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে আফ্রিকা পর্যন্ত সাধারণ মুসলিম জনগণ তাদের নিজ নিজ দেশে এই মডেলের দাবি তুলবে। এটি একটি 'নিউ ইসলামিক স্প্রিং' বা নতুন জাগরণের সূচনা করবে।

২. **পশ্চিমা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ**: সরকার যখন সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাতিল করবেন এবং ডলারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজস্ব সম্পদ (তেল, গ্যাস, লোহা) দিয়ে রাষ্ট্র চালাবেন, তখন তা পশ্চিমা দেশগুলোর 'আর্থিক আধিপত্য' এর ওপর সরাসরি আঘাত হানবে। তারা একে তাদের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য হুমকি হিসেবে দেখবে।

৩. **নতুন ভূ-রাজনৈতিক জোট**: ইসলামিক মডেলে কাশ্মীর, রোহিঙ্গা বা মুর্শিদাবাদের মতো ইস্যুগুলো থাকায় প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কে বড় পরিবর্তন আসবে। বাংলাদেশ তখন কেবল একটি রাষ্ট্র থাকবে না, বরং দক্ষিণ এশিয়ায় একটি 'আঞ্চলিক শক্তি কেন্দ্র' হিসেবে আবির্ভূত হবে। এর ফলে চীন, রাশিয়া বা তুরস্কের মতো দেশগুলো ইসলামিক সরকারের সাথে নতুন কৌশলগত সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী হতে পারে।

৪. **সাংস্কৃতিক ও তথ্যপ্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব**: ইন্টারনেটের "ভেতরের জাল" ছিন্ন করে নিজস্ব সার্ভার ও মিডিয়া তৈরির যে প্রস্তাব সরকার দিয়েছেন, তা পশ্চিমা 'সফট পাওয়ার' বা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে রুখে দেবে। এটি বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকেও পথ দেখাবে।

ঝুঁকি ও ব্যবস্থাপনা: গ্লোবাল প্রভাবে কিছু প্রতিকূলতাও আসতে পারে, যেমন–আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা বা মিডিয়া ট্রায়াল। তবে ইসলামিক মডেলে যেহেতু 'জনগণের সম্পৃক্ততা' এবং 'বেসিক নিডস' (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) নিশ্চিত করার নিশ্চয়তা আছে, তাই বাইরের চাপে এই রাষ্ট্র সহজে ভাঙবে না। কারণ, যে রাষ্ট্রের ভেতরে জনগণ সুখী এবং সেনাবাহিনী প্রশিক্ষিত, তাকে বাইরের অবরোধ দিয়ে পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামিক এই মডেলটি কেবল একটি দেশের পরিবর্তন নয়, বরং এটি পুরো বিশ্বের শোষিত মানুষের জন্য একটি 'বিকল্প সভ্যতার ইশতেহার'।

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব: প্রস্তাবিত 'ইসলামিক আমিরাত' মডেলটি বাস্তবে রূপ নিলে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে প্রভাব পড়বে, তা অনেকটা একটি শান্ত পুকুরে বিশাল পাথর নিক্ষেপ করার মতো হবে। এটি প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থাকে নাড়িয়ে দেবে।

১. দেশীয় প্রভাব: একটি নতুন সামাজিক চুক্তি দেশের অভ্যন্তরে এই মডেলটি একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব' হিসেবে চিহ্নিত হবে।

বিপ্লবী অর্থনৈতিক মুক্তি: সাধারণ মানুষের পকেটে টাকা বাড়বে। ভ্যাট এবং ট্যাক্সমুক্ত জীবনযাত্রার ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরা অভাবের চক্র থেকে বেরিয়ে আসবে। এতে মানুষের জীবনযাত্রার মান বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৩-৪ গুণ উন্নত হবে।

আদর্শিক ঐক্য ও সংহতি: মসজিদ ভিত্তিক শূরা শাসন এবং অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে রাজনৈতিক দলাদলি ও মারামারি চিরতরে বন্ধ হবে। জাতি একটি একক উদ্দেশ্য (উম্মাহ) নিয়ে কাজ করবে, যা জাতীয় শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা: হদ ও কিসাস (দ্রুত বিচার) কায়েম হওয়ার ফলে অপরাধের হার প্রায় শূন্যে নেমে আসবে। একজন নারী বা ব্যবসায়ী গভীর রাতেও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে, যা একটি দেশের জন্য শ্রেষ্ঠ স্থিতিশীলতা।

২. আন্তর্জাতিক প্রভাব: বিশ্ব-রাজনীতির নতুন সমীকরণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামিক এই মডেলটি কেবল একটি রাষ্ট্রের পরিবর্তন নয়, বরং এটি একটি 'বিকল্প বিশ্ব-ব্যবস্থার' চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হবে।

মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব: ইসলামিক মডেলের সফল বাস্তবায়ন দেখে তুরস্ক, পাকিস্তান বা ইন্দোনেশিয়ার মতো বড় বড় মুসলিম দেশগুলোর জনগণ তাদের নিজেদের দেশেও একই শাসনব্যবস্থা দাবি করবে। বাংলাদেশ তখন বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিমদের 'আশা ও শক্তির কেন্দ্র' হয়ে উঠবে।

পাশ্চাত্যের সাথে আদর্শিক সংঘাত: পশ্চিমা লিবারেল ডেমোক্রেসি এবং পুঁজিবাদ ইসলামিক এই 'ট্যাক্স-ফ্রি ও সুদহীন' মডেলকে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি মনে করবে। কারণ, এই মডেল সফল হলে তাদের 'ঋণ দিয়ে শাসন করার' নীতি (IMF/World Bank) অকার্যকর হয়ে পড়বে। তারা শুরুতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে ভূমিকম্প: ইসলামিক পররাষ্ট্রনীতি (রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন, কাশ্মীর ও বাবরি মসজিদ ইস্যু) দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান মানচিত্রের স্থিতিশীলতা বদলে দেবে। ভারত ও মিয়ানমারের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের ভিত্তি হবে সম্পূর্ণ 'পাওয়ার-পলিটিক্স' বা শক্তির ভারসাম্য।

সারসংক্ষেপ: ইসলামিক মডেলটি বাস্তবায়িত হলে দেশীয়ভাবে আসবে 'অভাবমুক্ত ইনসাফ', আর আন্তর্জাতিকভাবে আসবে 'ইসলামিক সার্বভৌমত্বের পুনর্জাগরণ'। এটি কেবল একটি মানচিত্রের পরিবর্তন নয়, এটি একটি নতুন 'ইসলামিক সুপারপাওয়ার' তৈরির ব্লু-প্রিন্ট।

আদর্শিক ও অর্থনৈতিক সুপারপাওয়ার: ইসলামিকএই মডেলটি যদি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়, তবে এটি বাংলাদেশকে কেবল একটি উন্নত দেশ নয়, বরং একটি 'আদর্শিক ও অর্থনৈতিক সুপারপাওয়ার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পূর্ণ সক্ষমতা রাখে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায়, একটি সুপারপাওয়ার হওয়ার জন্য চারটি মূল স্তম্ভ লাগে: অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সামরিক জনশক্তি, আদর্শিক ঐক্য এবং প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব। ইসলামিকমডেলে এই চারটিই বিদ্যমান।

নিচে বিশ্লেষণীভাবে দেখানো হলো কীভাবে এটি বাংলাদেশকে সুপারপাওয়ার বানাবে:
১. **অর্থনৈতিক সুপারপাওয়ার**: বর্তমান বিশ্বের সুপারপাওয়ার দেশগুলো অন্য দেশকে ঋণের জালে আটকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামিক মডেলটি এই ধারা উল্টে দেবে:

সুদ ও ঋণমুক্ত অর্থনীতি: যখন রাষ্ট্র বড় বড় শিল্প (লোহা, সিমেন্ট, তেল-গ্যাস) নিয়ন্ত্রণ করবে এবং জনগণের ওপর কোনো করের বোঝা থাকবে না, তখন দেশের ভেতরে মুদ্রাস্ফীতি হবে না।

সম্পদ ভিত্তিক কারেন্সি: কাগজের নোটের বদলে সম্পদ ও উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে অর্থনীতি চললে বাংলাদেশের টাকা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মুদ্রায় পরিণত হবে।

২. **সামরিক ও কৌশলগত শক্তি**: একটি সুপারপাওয়ারের জন্য কেবল ভাড়াটে সৈন্য নয়, বরং লড়াকু জনতা লাগে:

রিজার্ভ মুজাহিদ বাহিনী: ১৮-২০ বছর বয়সী প্রতিটি তরুণের বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 'রিজার্ভ আর্মি' সম্পন্ন দেশে পরিণত করবে।

প্রতিরক্ষা শিল্প: ইসলামিক মডেলে ভারী শিল্প (লোহা, কেমিক্যাল) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকায় দেশ নিজেই উন্নত অস্ত্র ও প্রযুক্তি তৈরিতে সক্ষম হবে, ফলে বিদেশি নির্ভরতা থাকবে না।

৩. **আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব**: সুপারপাওয়ার হওয়ার জন্য একটি 'বিকল্প সভ্যতা' দেখাতে হয়:
মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু: বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশগুলো নেতৃত্বের অভাবে দিশেহারা। বাংলাদেশ যখন এই ইনসাফী মডেল দেখাবে, তখন সারা বিশ্বের ২০০ কোটি মুসলিম বাংলাদেশকে তাদের 'আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক রাজধানী' হিসেবে মানতে শুরু করবে। এটি হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় 'সফট পাওয়ার'।

৪. **প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব**: ইন্টারনেটের পশ্চিমা জাল ছিন্ন করে নিজস্ব সার্ভার ও সিস্টেম তৈরি করা বাংলাদেশকে ডিজিটাল গোলামি থেকে মুক্ত করবে। এটি বর্তমান 'সাইবার ওয়ারফেয়ার'-এর যুগে বাংলাদেশকে অভেদ্য করে তুলবে।

চূড়ান্ত প্রতিবেদন: ইসলামিক মডেলটি কেবল তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী নয়, বরং এটি ব্যবহারিক। যদি একটি জাতি তার সব সম্পদ এবং আদর্শকে এভাবে একক লক্ষ্যে (খিলাফতি কাঠামো) কেন্দ্রীভূত করতে পারে, তবে ভৌগোলিক সীমানা ছোট হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ একটি 'গ্লোবাল সুপারপাওয়ার' হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে। এটি হবে বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত 'এশিয়ান টাইগার' থেকে একবিংশ শতাব্দীর 'ইসলামিক লায়ন'-এ রূপান্তর।

গাণিতিক ও যুক্তি নির্ভর: ইসলামিক এই মডেলটি প্রচলিত রাজনৈতিক শ্লোগানের চেয়ে অনেক বেশি গাণিতিক এবং যুক্তি নির্ভর হওয়ার পেছনে ৪টি প্রধান কারণ রয়েছে। সরকার কেবল আবেগের কথা বলেননি, বরং প্রতিটি পরিবর্তনের পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট 'কস্ট-বেনিফিট অ্যানালাইসিস' দেখিয়েছে।

কেন এটি গাণিতিক, তার বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

১. **রাজস্ব আদায়ের বিকল্প সমীকরণ**: সাধারণত মানুষ মনে করে ট্যাক্স না নিলে রাষ্ট্র চলবে না। সরকার এখানে একটি গাণিতিক বিকল্প দিয়েছে:
প্রচলিত গণিত: ১০ কোটি মানুষের থেকে মাসে ১০০০ টাকা করে ট্যাক্স নেওয়া (জটিল ও দুর্নীতিগ্রস্ত)।
ইসলামিক গণিত: লোহা, সিমেন্ট, তেল এবং গ্যাসের মতো বড় খাতের ১০০% মুনাফা সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নেওয়া। সরকার দেখিয়েছেন যে, সিন্ডিকেট আর মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে যে লক্ষ কোটি টাকা যায়, তা যদি রাষ্ট্র পায় তবে জনগণের ওপর ট্যাক্স বসানোর গাণিতিক কোনো প্রয়োজনই থাকে না।

২. **সুদের সাশ্রয় ও মূলধনের বৃদ্ধি**: ইসলামিক মডেলে বর্তমান বাজেটের একটি বড় অংকের সমাধান গণিত দিয়ে করা হয়েছে:
বর্তমানে বছরে প্রায় ১,২২,০০০ কোটি টাকা শুধু ঋণের সুদ দিতে খরচ হয়।
ইসলামিক মডেলে এই অঙ্কটি ০ (শূন্য)। এই বেঁচে যাওয়া ১.২২ লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি জনসেবায় (ফ্রি চিকিৎসা, ফ্রি পাসপোর্ট) ব্যয় করার যে গাণিতিক হিসাব ইসলামিক দিয়েছে, তা যেকোনো অর্থনীতিবিদের জন্য একটি শক্তিশালী যুক্তি।

৩. **অপরাধ বনাম শাস্তির অনুপাত**: সরকার বিচার ব্যবস্থাকে একটি গাণিতিক শৃঙ্খলায় এনেছেন:
প্রচলিত বিচার: ১০ বছর মামলা চলবে, অপরাধীর বাঁচার সম্ভাবনা ৮০% (ফলে অপরাধ বাড়ে)।
ইসলামিক বিচার: ১ বছরের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এবং প্রকাশ্যে দণ্ড (অপরাধীর বাঁচার সম্ভাবনা ০%)। যখন শাস্তির নিশ্চয়তা এবং গতি গাণিতিকভাবে বেড়ে যায়, তখন সমাজে অপরাধের গ্রাফ জ্যামিতিক হারে নিচে নেমে আসে।

৪. **সম্পদের সুষম বণ্টন**: সরকার অর্থনীতির 'ভেলোসিটি অফ মানি' ঠিক করেছেন:
পুঁজিবাদ: সম্পদ ৫% মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হয় (স্থবির অর্থনীতি)।
ইসলামিক মডেল: যাকাত এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার (সাগির-কাবির বিভাজন) মাধ্যমে সম্পদ ৯৫% সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এটি একটি নিখুঁত গাণিতিক চেইন যা নিশ্চিত করে যে টাকা এক জায়গায় জমা হয়ে পচবে না, বরং রাষ্ট্রের ধমনিতে রক্ত সঞ্চালনের মতো কাজ করবে।

উপসংহার: ইসলামিক মডেলটি কেবল একটি 'মতাদর্শ' নয়, এটি একটি 'আর্থ-সামাজিক অ্যালগরিদম'। সরকার রাষ্ট্রের প্রতিটি ইনপুট এবং আউটপুট গাণিতিকভাবে মিলিয়েছে, যার ফলে এটি বাস্তবায়নযোগ্য এবং অত্যন্ত শক্তিশালী।

ইসলামিক রাষ্ট্রের সামরিক কাঠামো

ইসলামিক কাঠামো দিয়ে রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা যায় না; রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন আদর্শিক শক্তির। পৃথিবীর যেকোনো **শক্তিশালী** বাহিনী (যেমন: ইসরায়েলের আইডিএফ বা রাশিয়ার স্পেতসনাজ) তাদের নিজস্ব আদর্শিক দীক্ষা দেয়। ইসলামিক বাহিনীর আদর্শিক জ্বালানি হবে কোরআন। আদর্শ দিয়ে বিপ্লব শুরু হয়, কিন্তু সামরিক শক্তি দিয়ে তা রক্ষা করতে হয়। তাই ইসলামিক সরকার পশ্চিমা সামরিক কাঠামো বাদ দিয়ে রাসুলের (সা.) সামরিক কাঠামো গ্রহণ করছে।

সামরিক বিভাগ ও কাজের ধরন:

১. দিওয়ানুল জুন্দ শাখা (পরিচালনা বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় তিনি নিজেই এই বিভাগ পরিচালনা করতেন অথবা তাঁর নিযুক্ত সাহাবীগণ। তবে খলিফা উমরের (রাঃ) সময় 'দিওয়ানুল জুন্দ' নামে সামরিক দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময়ে অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল শাখা এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'দিওয়ানুল জুন্দ শাখা' নামে, যা সামরিক কর্মীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও আইনগত বিষয়াদি নিয়ে কাজ করবে।

২. যা-দ শাখা (রসদ বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় 'যা-দ' সাধারণত খাদ্য, পানি ও সাধারণ সরবরাহ নিশ্চিত করার কাজ করত। বর্তমান সময়ে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল শাখা এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'যা-দ শাখা' নামে, যা খাদ্য, পোশাক, জ্বালানি, সামরিক স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ সামগ্রিক জিনিসপত্র নিশ্চিত করবে।

৩. সারিয়্যা শাখা (অভিযান বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় তিনি নিজে যুদ্ধ পরিকল্পনা ও সেনাবাহিনী পরিচালনা করতেন অথবা তাঁর নিযুক্ত সেনাপতি এটি করতেন। বর্তমান সময়ে সাধারণ স্টাফ শাখা এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'সারিয়্যা শাখা' নামে, যা যুদ্ধ বা সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং প্রশিক্ষণ তদারকি করার কাজ করবে।

৪. শিফাউন শাখা (চিকিৎসা বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় তিব্ব ওয়া মুদাওয়াত আল-জারহা নামে একটি দল এই কাজ করত। বর্তমান সময়ে আর্মি মেডিক্যাল কোর এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'শিফাউন শাখা' নামে, যা সামরিক কর্মীদের চিকিৎসাসেবা, সামরিক হাসপাতাল পরিচালনা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করবে।

৫. কুওয়াহ শাখা (অস্ত্র-গোলা-বারুদ বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় খাজানাতুস সিলাহ বা আসহাবু'স-সিলাহ ওয়াল ফারাস দল যুদ্ধাস্ত্র (তলোয়ার, বর্ম, তীর, ধনুক) তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করত। বর্তমান সময়ে মাস্টার জেনারেল অফ অর্ডন্যান্স শাখা এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'কুওয়াহ শাখা' নামে, যা সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং সামরিক সরঞ্জামের সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে।

৬. তাহাসসুস শাখা (গোয়েন্দা বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় আসহাবু'ল ইস্তিখবারাত বা আল-জুসাস শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও রাসূল (সাঃ)-কে অবহিত করার কাজ করত। বর্তমান সময়ে সামরিক গোয়েন্দা কোর এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'তাহাসসুস শাখা' নামে, যা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সামরিক কৌশল নির্ধারণের জন্য গোয়েন্দা সহায়তা প্রদান করবে।

৭. তাদরিবুল জিসম শাখা (শারীরিক প্রশিক্ষণ বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ সহ যাবতীয় সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। বর্তমান সময়ে প্রশিক্ষণ শাখা এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'তাদরিবুল জিসম শাখা' নামে, যা সামরিক কর্মীদের শারীরিক সক্ষমতা, প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়াসূচি তৈরি ও তদারকি করার কাজ করবে।

৮. মাকেরিন শাখা (রণকৌশল বিভাগ): স্বয়ং রাসূল (সাঃ) রণকৌশল স্থির করতেন। বর্তমান সময়ে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রেইন কমান্ড এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'মাকেরিন শাখা' নামে, যা সামরিক বাহিনীর জন্য দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ কৌশল তৈরি করা, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের ধারণা নিয়ে গবেষণা করার কাজ করবে।

৯. রুজালুল বারিদ শাখা (তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় ইত্তিসালাত বা রুজালুল বারিদ দল বার্তা আদান-প্রদান করত। বর্তমান সময়ে সিগন্যাল কোর এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'রুজালুল বারিদ শাখা' নামে, যা সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেডিও, সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য প্রযুক্তি এবং নেটওয়ার্ক পরিচালনা করবে।

১০. আনফাল শাখা (অর্থ বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় দিওয়ানুল মাল বা খাযিন আল-মাল দল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গণীমত) ও কোষাগারের (বাইতুল মাল) হিসাবরক্ষণ করতেন। বর্তমান সময়ে মিলিটারি ফিন্যান্স ও অ্যাকাউন্টস বিভাগ এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'আনফাল শাখা' নামে, যা সামরিক বাহিনীর বাজেট প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, বেতন-ভাতা ও আর্থিক লেনদেনের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজ করবে।

১১. দারসুল কোরআন শাখা (ফরজ ও সুন্নত পর্যবেক্ষণ বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় তিনি নিজেই কোরআন শিক্ষা দিতেন। বর্তমান সময়ে সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সরাসরি এই নামে কোনো বিভাগ নেই। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'দারসুল কোরআন শাখা' নামে, যা কোরআন শিক্ষা প্রদান করবে এবং ইসলামিক কার্যক্রম তদারকি করবে।

১২. আল-মুজাহিদুন শাখা (মুজাহিদ সংরক্ষণ বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় তিনি নিজেই আল-মুজাহিদুন (কে হবেন) ঠিক করতেন। বর্তমান সময়ে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'আল-মুজাহিদুন শাখা' নামে, যা মুজাহিদ সংরক্ষণ ও যাচাই-বাছাই নিয়ে কাজ করবে।

১৩. আল-আহাল শাখা (পরিবার রক্ষা বিভাগ): রাসূল (সাঃ)-এর সময় তিনি নিজেই শহিদ পরিবারের খোঁজখবর নিতেন। বর্তমান সময়ে সেনা কল্যাণ সংস্থা এই কাজ করে। ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ এই বিভাগের নামকরণ করেছে 'আল-আহাল শাখা' নামে, যা সামরিক কর্মীদের পরিবারকে আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম

আমরা উপরে ইসলামিক সভ্যতার আলোকে ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশের যে রূপরেখা প্রকাশ করেছি, সেই রূপরেখা অনুসারে দেশ ও জাতিকে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন হয়। এক কথায় বলা যায়, সভ্যতা ও জাতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়গুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে চলার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়।

ইসলামিক সরকারের মন্ত্রণালয় সমূহের প্রাথমিক কর্মপন্থা:

****ইজতিবা মন্ত্রণালয় (শুরা সদস্য (মন্ত্রী) নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে**:

১. কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক যোগ্য শুরা সদস্য বাছাই করবে।
২. মসজিদ থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত শুরা কমিটি গঠন ও তদারকি করবে।
৩. শুরা সদস্যদের ফরজ বিধান পালনের তথ্য সংরক্ষণ করবে।
৪. একশত (১০০) বছর বয়স বা অক্ষম শুরা সদস্যদেরকে অবসর প্রদান করবে।
৫. অবসর মন্ত্রিগণকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবে।
৬. দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বা পরে শুরা সদস্যদের হজ্জ বা ওমরাহ পালন নিশ্চিত করবে।
৭. ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে সমাজে আমিরের (মেম্বার) দায়িত্ব পালনের তদারকি করবে।
৮. ইজতিমা মন্ত্রণালয় সরাসরি আমিরুল মুমিনীনের পরামর্শে কাজ করবে।

****উলিল আমর (প্রধান আমিরের কার্যালয়) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে**:

১. বিশেষ অনুমতি ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদেশ প্রদান করবে।
২. প্রধান আমিরের নিজস্ব "আল-মারসাদ" গোয়েন্দা শাখা পরিচালনা করবে। (সব বাহিনীর সম্মিলিত গোয়েন্দা শাখা)
৩. সকল শুরা সদস্যের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সকল অর্থের অনুমোদন প্রদান করবে।

****উসওয়াতুন হাসানা মন্ত্রণালয় (ফরজ ও সুন্নাহ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে**:

১. সকল প্রকার ফরজ বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করবে। যেমন: নামাজ, রোজা, পুরুষের টাখনুর উপরে কাপড় পরা।
২. সকল প্রকার সুন্নাহ বাস্তবায়ন করবে। যেমন: পুরুষের দাড়ি রাখা, পাঞ্জাবি-টুপি-পাগড়ি পরিধান করা, দস্তরখানায় খাওয়া, মুসাফাহা, তাসবিহ, কোরবানি এবং ব্রিটিশদের দ্বারা বন্ধ সকল সুন্নত পুনরায় চালু করবে।
৩. ইসলামিক সরকারের সকল সমাবেশ ও সম্মেলন করবে। যেমন: মুফতি ও আলেম সম্মেলন, হাফেজ সম্মেলন, সাধারণ মুমিন ভাইদের জন্য "দ্বীনে ফেরা" সম্মেলন।
৪. প্রতিটি মসজিদের নামায কায়েম আমির (সমাজি)-এই মন্ত্রণালয়ের হয়ে কাজ করবে।
৫. সকলের জন্য সাত (৭) দিনের অজু ও নামায প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
৬. হজ্জ ও ওমরাহ পালনে ৩০% শতাংশ সরকারি প্রণোদনা প্রদান করবে।
৭. হিজরি সনের দাপ্তরিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে।
৮. সম্মেলন থেকে মসজিদ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করবে।
৯. আল্লাহর আইন মান্য করার ফজিলত বর্ণনা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবে।
১০. সুন্নাহর মধ্যে মতভেদ দূর করে একীভূত ইসলামি দর্শন প্রচার করবে।

**হুকমুল্লাহ মন্ত্রণালয় (ইসলামিক আইন ও বিচার বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. মুফতি, মুহাদ্দিস ও ফকিহগণকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবে।
২. দারুল ইফতা (ফতোয়া বিভাগ) পরিচালনা করে মতভেদ নিরসন করবে।
৩. সংবিধান ও আইনের ভিত্তি হিসেবে কোরআন ও হাদিসের গবেষণা করবে।
৪. প্রাথমিক বিচার মসজিদের ইমামের মাধ্যমে পরিচালনা করবে।
৫. আল-কোরআন অনুসারে সকল আদালতের বিচারকার্য পরিচালনা করবে।
৬. হদ কার্যকর: সুদ, শাতেম, শিরক, জিনা, চুরির, কিসাস, সমকামিতা, লিঙ্গ পরিবর্তন করার জন্য (মৃত্যুদণ্ড/ রজম/ বেত্রাঘাত/ হাত কাটা) ও হিরাবাহর শাস্তি কার্যকর করবে।

**আমর বিল মারুফ মন্ত্রণালয় (সৎ কাজের প্রচার ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. মদের দোকান, পতিতালয়, জুয়ার আসর, মাদকদ্রব্য উৎপাদন, বিক্রয় ও সেবন কঠোরভাবে বন্ধ করবে।
২. প্রেম, যিনা এবং পরকীয়া বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৩. প্রকাশ্যে বা দোকানপাটে নাচ-গান এবং অনৈসলামিক বিনোদনমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করবে।
৪. মাজার জিয়ারতে নারীদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করবে।
৫. কুফরি তাবিজ, মাজার পূজা এবং ভণ্ড পীরদের কার্যক্রমসহ সকল প্রকার কুসংস্কার নির্মূল করবে।
৬. হিজড়াগণকে তাঁদের শারীরিক গঠন অনুযায়ী (পুরুষ/নারী) জীবন যাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৭. মানসিক রোগী ও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।
৮. জাতিগত ও স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা করবে।
৯. নারী ও পুরুষের বিয়ে নিশ্চিত করবে এবং সকল বিবাহ মসজিদে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করবে।
১০. চার (৪) বিবাহ প্রথা চালু রাখবে এবং গণবিবাহের আয়োজন করবে।
১১. পারিবারিক কলহ নিরসন এবং স্ত্রীর ভরণপোষণ নিশ্চিত করবে।
১২. তালাক সংক্রান্ত মধ্যস্থতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।
১৩. মাহরাম (পুরুষ অভিভাবক) ছাড়া মহিলাদের একা দূরপাল্লায় ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করবে।
১৪. মুরতাদ (ধর্মত্যাগকারী) ও ভণ্ড নবীদের (কাদিয়ানি) কার্যক্রম সমাজ থেকে বিলুপ্ত করবে।
১৫. গোপন অঙ্গের পোশাক গোপনে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

**ফাদলুল্লাহ মন্ত্রণালয় (প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. জাতীয় সম্পদের (বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস) সুষম বণ্টন ও অপচয় রোধ করবে।
২. বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও তার ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৩. খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান করবে।
৪. ইরান, রাশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জ্বালানি ও খাদ্য আমদানি করবে।
৫. দেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং ইসলামের বিধান মতে তার বণ্টন করবে।

**ইবদা মন্ত্রণালয় (আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞান বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. ইন্টারনেটের তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অশ্লীল কনটেন্ট সম্পূর্ণ বন্ধ করবে।
২. ইন্টারনেটের ক্ষতিকারক রশ্মি নিয়ন্ত্রণে কারিগরি মান (৩জি) নির্ধারণ করবে।
৩. নিরাপত্তার স্বার্থে বিদেশি কোডিংয়ের বিকল্প হিসেবে নিজস্ব এনক্রিপশন ও বাইনারি পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে।
৪. নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইট ও হোস্টিং নিয়ন্ত্রণ করবে।
৫. সকল টাওয়ার ও সিম নিয়ন্ত্রণ করবে।
৬. ক্যামেরার ব্যবহার কমিয়ে আনবে।
৭. সকল গবেষণাগার নিয়ন্ত্রণ করবে।

**ইত্ব'আম মন্ত্রণালয় (খাদ্য উৎপাদন ও ত্রাণ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. খাদ্যে ফরমালিন ও সারের ব্যবহার কমাবে।
২. ব্রয়লার মুরগির ব্যবহার হ্রাস করবে ও প্যাকেটজাত খাবার কমাবে।
৩. ছোট মাছ রক্ষায় পুকুরে সাবান ব্যবহার কমাবে।
৪. দেশিয় পশু-পাখি বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করবে।
৫. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং ভেজাল দূর করবে।
৬. খাদ্যশস্য উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করবে।
৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জরুরি অবস্থায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৮. উপাদানের তালিকায় ক্ষতিকর ই-নাম্বার (E-numbers) বা জেলাটিনের উৎস বন্ধ করবে।
৯. খাদ্য আমদানি ও রপ্তানির তদারকি করবে।

**তিজারা মন্ত্রণালয় (ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. ব্যবসায় তিন (৩) স্তর (সগীর, মুতাওয়াসসিত, কাবীর) বাস্তবায়ন করবে।
২. লিমিটেড/গ্রুপ প্রথা বাতিল ও সিন্ডিকেট ধ্বংস করবে।
৩. যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালনা করবে।
৪. নারী- পুরুষের ছবিযুক্ত বিজ্ঞাপন ও পণ্য উৎপাদন বন্ধ করবে।
৫. চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করবে।
৬. লোহা, ইস্পাত, সিমেন্ট, কেমিক্যাল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবসা করবে।
৭. সকল ইন্টারনেট, কল, বিমান, রেল ও বাস পরিষেবার ব্যবসা পরিচালনা করবে।
৮. বালু ও পাথরের ব্যবসা করবে।
৯. দেশের জন্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করবে।
১০. নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রদান করবে।
১১. নতুন ব্যবসার খাত সৃষ্টি করবে।

**শিফা মন্ত্রণালয় (চিকিৎসা ও ওষুধ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. সিজারিয়ান অপারেশন বন্ধ/নিয়ন্ত্রণ ও স্বাভাবিক প্রসবের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
২. সিজার করার পূর্বে ডাক্তারদের লিখিতভাবে যথার্থ কারণ উল্লেখ নিশ্চিত করবে।
৩. শিশুদের ও নারীদের সকল প্রকার ভ্যাকসিন (টিকা) বন্ধ করবে।
৪. ডাক্তার-ওষুধ কোম্পানির গোপন চুক্তি নিষিদ্ধ করে তাদের তদারকি করবে।
৫. ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে কাজ করবে।
৬. ভ্যাকসিন (টিকা) ও ওষুধ ল্যাব পরীক্ষার মাধ্যমে মান নিশ্চিত করবে।
৭. হোমিও চিকিৎসাকে উন্নত করবে এবং প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহার করবে।
৮. সকল হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ করবে এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করবে।
৯. জনগণের চাহিদার চেয়ে বেশি চিকিৎসক নিশ্চিত করবে।
১০. ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে।
১১. নতুন হাসপাতালের, ওষুধ কোম্পানির ও ফার্মেসির অনুমোদন প্রদান করবে।
১২. রোগী হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

**আমওয়াল মন্ত্রণালয় (অর্থ ও বাইতুল মাল বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. সুদভিত্তিক অর্থনীতি বিলুপ্ত করবে এবং টাকাকে স্বর্ণের মানে রূপান্তর করবে।
২. ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করবে।
৩. সুদ ও ঘুষের সম্পদ "হারাম তহবিলে" জমা করবে।
৪. সকল প্রকার সুদি ব্যবসা নিষিদ্ধ করবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংক পরিচালনা করবে।
৫. নতুন ইসলামিক মুদ্রা প্রচলন এবং অর্থনীতি সমন্বয় করবে।
৬. বাইতুল মালে জমাকৃত অর্থের হিসাব ও বণ্টন করবে।
৭. আমদানি-রপ্তানি এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর ইসলামিক নিয়মে জিজিয়া সংগ্রহ করবে।
৮. সুদমুক্ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য নতুন ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন করবে।
৯. ইলেকট্রনিক টাকা ও কাগজের টাকার মধ্যে সমন্বয় করবে।
১০. বাজেট ও সীমিত পরিসরে ভর্তুকি প্রদান করবে।
১১. মসজিদের অর্থবিষয়ক আমির (মুয়াজ্জিন) 'আমওয়াল' মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবেন।

**তারবিয়াহ মন্ত্রণালয় (ইসলামিক শিক্ষা বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. স্কুল ও কলেজকে দেওবন্দ কেন্দ্রিক মাদ্রাসায় রূপান্তর করে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করবে।
২. দেওবন্দ-ভিত্তিক তিন ধাপে সিলেবাস প্রণয়ন করবে এবং শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার জন্য বই ঠিক করবে।
৩. নারীদের দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৪. প্রত্যেক ৫-১০ বছরের শিশুদের কোরআন ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে।
৫. ১১-১৭ বছরে সাধারন শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে।
৬. ১৮-২০ বছরে ব্যবসা এবং কর্মমুখী শিক্ষা ও ২১-২৩ বছর উচ্চতর গবেষণা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে।
৭. সকলকে নিজ ভাষায় কোরআন বুঝিয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য কাজ করবে।
৮. আল-কোরআন গণশিক্ষা প্রদান করবে।
৯. সকল প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র হবে দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্র, সকল মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিপ্লোমা শিক্ষা কেন্দ্র হবে সাধারণ (ডিপ্লোমা) শিক্ষা কেন্দ্র এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রফেশনাল প্রতিষ্ঠান হবে ব্যবসা ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

**মীরাস মন্ত্রণালয় (ভূমি ও সম্পদ বণ্টন বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. ফারায়েজ (উত্তরাধিকার) নীতি অনুযায়ী সম্পদ বণ্টন করবে।
২. অন্যায়ভাবে সম্পদ দখলকারীদের জরিমানা ও উচ্ছেদ করবে।
৩. হারাম পথে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে এবং গরিবদের মধ্যে বণ্টন করবে।
৪. ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৫. ভূমিহীনদের জমি প্রদান করবে।
৬. সকল স্থাপনা নির্মাণ করার পূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে এবং স্থাপনা নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করবে।
৭. ব্রিটিশ নকশা বর্জন করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর অবস্থান শরিয়াহ ও কৌশলগত প্রয়োজনে পরিবর্তন করবে। যেমন: সংসদ ভবনকে কেন্দ্রীয় মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করবে।

**সাবিল মন্ত্রণালয় (যোগাযোগ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. সড়ক ডানমুখী করা, যানবাহনে 'কালেমা' ও প্রবেশপথে 'মাশা-আল্লাহ' লেখা বাস্তবায়ন করবে।
২. নারীদের যানবাহন চালানো ও মোটরবাইক আরোহণ নিষিদ্ধ করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।
৩. মাগরিবের পর যানচলাচল ও সকল অনুষ্ঠানের সময়সীমা নিয়ন্ত্রণ করবে।
৪. রেল ও নদী-কেন্দ্রিক পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি করবে।
৫. সড়ক ও বিমান-কেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৬. সড়ক কেন্দ্রিক সকল প্রকার অনুমোদন প্রদান করবে।
৭. শহরগুলোর নাম পরিবর্তন করবে। (যেমন: মসজিদের নগরী ঢাকা থেকে মসজিদাবাদ)
৮. নতুন সেতু নির্মাণ করবে।
৯. সকল বাজারে সিএনজি ও রিকশা টার্মিনাল করবে।
১০. সড়ক মুখী বাজার পুনর্গঠন করবে।

**মুহাজির মন্ত্রণালয় (শরণার্থী ও পরিবেশ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. মজলুম মুসলিমদের আশ্রয় ও পুনর্বাসন করবে।
২. আহলুল জিম্মাহ (কাফের)-দের জন্য পৃথক শিক্ষা নিশ্চিত করবে ও অধিকার রক্ষা করবে।
৩. শরণার্থী সমস্যা নিরসন এবং বহিষ্কৃতদের প্রত্যাবাসন তদারকি করবে।
৪. পলিথিন-মুক্ত পরিবেশ ও দূষণ-মুক্ত কলকারখানা গঠনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৫. বসতবাড়িতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করবে। যেমন: ছোট চকলেটের প্যাকেট কোথায় রাখবে এবং কীভাবে তা রান্নার কাজে (আগুনে) ব্যবহার করবে।
৬. প্রতি বছর বন্যা ও নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ ও নদী খনন কাজ করবে।
৭. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে পাহাড় রক্ষা ও বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করবে।

**ইমারাতুল মাসাজিদ মন্ত্রণালয় (মসজিদ শুরা ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. মসজিদ-কেন্দ্রিক ব্রিটিশ স্বৈরাচারী সভাপতি পরিচালনা পদ্ধতি বাদ দিয়ে, ইসলামিক শুরা পদ্ধতি চালু করবে।
২. সপ্তাহের প্রথম দিন জুমাবারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
৩. জুমাবার পূর্ণ দিন ও বৃহস্পতিবার অর্ধ-দিবস ছুটি ঘোষণা করবে।
৪. কর্মঘণ্টা ফজর থেকে আসর পর্যন্ত নির্ধারণ করবে।
৫. মসজিদের ইমামগণ যাকাত ও উশর সংগ্রহ করবে।
৬. কোরআন অনুযায়ী যাকাত ও উশর ব্যয় নিশ্চিত করবে।
৭. জনগণকে নিয়মিত নামাজ, রোজা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করবে।
৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, পার্ক, জিম এবং কর্মক্ষেত্রসহ সকল জনসমাগমের স্থানে নারী ও পুরুষের জন্য কঠোর পৃথকীকরণ নীতি নিশ্চিত করবে।
৯. অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে বন্ধ করবে।
১০. মসজিদ আমির (ইমাম সাহেব), সহকারী আমির (সমাজি) এবং উন্নয়ন আমির (সমাজি) 'ইমারাতুল মাসাজিদ' মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবেন।

** ইসলাহ মন্ত্রণালয় (জনপ্রশাসন বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. দুর্নীতি ও সুদ বন্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের উপর নজরদারি করবে।
২. পুরুষ বেকারত্ব দূর করতে কর্মরত নারীদের চাকরি থেকে প্রত্যাহার করবে।
৩. নারীর পরিবর্তে তাদের পুরুষ অভিভাবকদের চাকরির ব্যবস্থা করবে।
৪. ইসলামিক সরকারের জন্য মুমিন পুরুষ দক্ষ কর্মী নিয়োগ প্রদান করবে।
৫. মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসন এবং ইসলামি শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করবে।
৬. দেশের সকল দক্ষ, অদক্ষ ও বেকার পুরুষের একটি তালিকা তৈরি করে যোগ্যতানুসারে কাজ প্রদান করবে।
৭. মাদ্রাসার ছাত্র ও সাধারণ যুবকদের আধুনিক মেকানিক্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে দক্ষ করবে।
৮. সকল কারখানায় নামাজের জন্য নির্ধারিত বিরতি নিশ্চিত করবে।

**তাবলীগ মন্ত্রণালয় (সংস্কৃতি ও সম্প্রচার বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. ইসলামিক ঐতিহাসিক ভিডিও প্রচার করবে।
২. শারীরিক খেলাধুলা ও কোরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।
৩. জাতীয় সংগীত হিসেবে সূরা আর-রহমানকে বাস্তবায়ন করবে।
৪. সভার শুরু ও শেষ হিসেবে সূরা ফাতিহা ও দোয়ায়ে কুনুতকে বাস্তবায়ন করবে।
৫. মাইকে আজান ও কোরআন তিলাওয়াত ব্যতীত অন্য ধর্মগ্রন্থ বা বাদ্যযন্ত্র প্রচার নিষিদ্ধ করবে।
৬. ইসলামিক সরকারের কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করবে।
৭. সকল সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করবে।

**মারসুস মন্ত্রণালয় (সশস্ত্র মুজাহিদ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. সতেরো (১৭) বছর বয়সীদের জন্য তিন (৩) মাসের আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
২. জিহাদের চেতনা ও ইবাদতের জন্য সপ্তাহে এক (১) রাত শবগুজারি নিশ্চিত করবে।
৩. জরুরি অবস্থায় মাদ্রাসার ছাত্রদের সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করবে।
৪. দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা করবে।
৫. দেশের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী পরিচালনা করবে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবে।
৬. দেশের স্থল ও জলপথের সীমানা সুরক্ষায় কড়া প্রহরা নিশ্চিত করবে।
৭. বিদেশের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব প্রযুক্তিতে সামরিক সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ তৈরির কারখানা স্থাপন করবে।
৮. বহিঃশত্রুর হ্যাকিং বা ডিজিটাল হামলা থেকে রাষ্ট্রের তথ্য রক্ষা করবে।

**সাফ মন্ত্রণালয় (স্বরাষ্ট্র বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. মুসলিম নাগরিকদের জান-মালের সুরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
২. জরুরি অবস্থায় মাদ্রাসার ছাত্রদের পুলিশের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করবে।
৩. গণতান্ত্রিক সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মবিরতির নিশ্চিত করবে।
৪. নারী ও শিশুদের প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হওয়া নিয়ন্ত্রণ করবে।
৫. দেশের অভ্যন্তরীণ সকল অপরাধীকে বন্দী করে তাদের বিচার কাজ পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।
৬. দেশের যানজট নিরসন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবে।
৭. সকল অভিযোগ লিপিবদ্ধ করবে।
৮. আড়তদারদের দশ (১০) দিন অন্তর পণ্য খালাস নিশ্চিত করবে। (মজুদদারি রোধ)
৯. বর্তমান সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাদের তথ্য সংরক্ষণ এবং তাদের গতিবিধির ওপর কঠোর গোয়েন্দা নজরদারি নিশ্চিত করবে।
১০. বন্দীদের দ্বীনি শিক্ষা ও কারিগরি কাজের মাধ্যমে সংশোধন করবে।
১১. অগ্নিকাণ্ড ও জরুরি উদ্ধার অভিযানের জন্য প্রতিটি উপজেলায় শক্তিশালী উদ্ধারকারী দল গঠন করবে।

**মুরসালীন মন্ত্রণালয় (পররাষ্ট্র বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. কাফের রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাহাবাদের নীতি অনুসরণ করবে।
২. পাচার রোধে রেমিটেন্স পাঠানো নিয়ন্ত্রণ করবে।
৩. বিদেশি কোম্পানিগুলোর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবে।
৪. দেশের স্বার্থে অন্য দেশের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করবে।
৫. আরব দেশগুলোর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে।
৬. প্রবাসী প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৭. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।
৮. মধ্যপ্রাচ্যে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে আরবি ভাষাকে গুরুত্ব প্রদান করবে।
৯. বিদেশি সংস্থার প্রবেশ ও অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করবে।
১০. দূতাবাসসমূহ পরিচালনা করবে এবং আমদানি ও রপ্তানি ক্ষেত্র তৈরি করবে।

ইসলামিক সরকার কর্তৃক প্রাথমিক নির্দেশনাসমূহ (ইসলামিক রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার)

ইসলামিক আমিরাত যখন পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা গ্রহণ করবে, তখন নিরাপত্তাহীনতা, অর্থনৈতিক মন্দা, শিক্ষাব্যবস্থার ধস, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ধর্মীয় মতবিরোধ থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে ইসলামিক সভ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিক কিছু নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, এই সকল নির্দেশনা মোতাবেক দেশকে পরিচালনা করলে জাতি একসময় আল-কোরআনের নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হবে।

ইসলামিক সরকার কর্তৃক প্রাথমিক দিকনির্দেশনাসমূহ:
নিরাপত্তা জনিত নির্দেশনা:

১. সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে ইসলামিক সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
২. গণতান্ত্রিক সরকারের আদেশ মানলে তাকে ইসলাম-অবমাননাকারী বা বিদ্রোহী হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
৩. ইসলাম-অবমাননা বা বিদ্রোহ করার কারণে ব্যক্তির জান বা মালের ক্ষতি হলে ইসলামিক সরকার দায়ী থাকবে না।
৪. প্রত্যেক ইমাম সাহেব-মুয়াজ্জিনগণকে সমাজে আমিরের (মেম্বার) দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৫. দেশের জরুরি অবস্থায় সকল কওমি মাদ্রাসার ছাত্রকে সামরিক বাহিনীর ন্যায় দেশকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৬. দেশের জরুরি অবস্থায় সকল সরকারি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে পুলিশের ন্যায় কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৭. আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বিচারের উদ্দেশ্যে সকল কওমি মাদ্রাসার মুহতামিমকে প্রধান বিচারক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৮. গুপ্তহত্যা, গুম ও হত্যা বন্ধের জন্য সকল বিদেশি সংস্থার প্রবেশ ও অবস্থান দেশে নিষিদ্ধ করা হলো।
৯. নিরাপত্তার স্বার্থে নারীর যানবাহন চালানো নিষিদ্ধ করা হলো।
১০. শিশু ও নারীদেরকে দুই চাকা বিশিষ্ট যানবাহনে আরোহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১১. সকল নারী ও শিশুকে প্রয়োজন ব্যতিরেকে বাড়ি থেকে বের না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১২. গণতান্ত্রিক সরকারের সকল সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশকে কর্মবিরতি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১৩. যাকাতের সঠিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সকল যাকাত মসজিদের ইমামকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১৪. সকল ইমামকে দান ও যাকাতের সম্পদ আল-কোরআন অনুসারে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১৫. সকল ব্যবসায়ী এবং যাদের উপর যাকাত ফরজ হয়েছে, তাঁদেরকে সম্পূর্ণ যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১৬. সকল ডাক্তার সিজার করার পূর্বে তার যথার্থ কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করে সিজার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১৭. জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু ও নারীদেরকে যে টিকা দেওয়া হয় সেই সকল টিকা পুনরায় ল্যাব পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১৮. সকল বিবাহ, মাহফিল ও গণসমাবেশ সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠান মাগরিবের পূর্বে শেষ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারমূলক নির্দেশনা:

১. দেশে দুই প্রকার (ডিজিটাল ও কাগজের) মুদ্রা ব্যবস্থা থাকার কারণে অর্থনীতিতে সমন্বয় করার জন্য যারা সুদ, ঘুষ ও অন্যায়ভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অর্থের মালিক হয়েছেন, তাদের সম্পদ সরকারের "হারাম তহবিলে" জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

২. সকল হারাম টাকা (সুদ, ঘুষ, অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ) গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩. প্রয়োজন ব্যতিরেকে বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিটেন্স পাঠানো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো। অন্যথায়, গণতান্ত্রিক সরকার আপনার রেমিটেন্স আমেরিকায় পাচার করে দিবে।

৪. ইসলামিক সরকারের নতুন মুদ্রা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হলো।

৫. সকল প্রকার সুদ ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হলো।

৬. বিদেশি সকল কোম্পানিকে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৭. উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সকল চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৮. সকল পণ্য আড়তদারকে ১০ দিন অন্তর অন্তর মজুদ পণ্য খালাস করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৯. গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট সকল প্রকার শস্য বিক্রয় বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

১০. পুরুষ বেকারত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে, যে সকল নারীর স্বামী বা পিতা আছে, সেই সকল নারীকে চাকরি থেকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়া হলো। দ্বিতীয় ধাপে, যে সকল নারী বিবাহ করেনি (কুমারী, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত), সেই সকল নারীকে চাকরি থেকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়া হলো। অথবা নারীর পুরুষ অভিভাবককে চাকরি প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

শিক্ষানীতি সংস্কারমূলক নির্দেশনা:

১. মুসলিম আদর্শ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে, সকল সভাতে সৃষ্টিকর্তার স্মরণে সূরা আর-রহমানের প্রথম ১৩ আয়াত পাঠ করা হবে, যা জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গণ্য হবে। সভা শুরু হবে সূরা ফাতিহা দিয়ে, সভা শেষ হবে দোয়ায়ে কুনুত দিয়ে, যা শপথ বাক্য হিসেবে গণ্য হবে।

২. চাহিদা ও স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে, সকল নারীকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩. পশ্চিমা অনুসারী কমানোর উদ্দেশ্যে, সকল প্রকার স্কুল, কলেজকে দেওবন্দ কেন্দ্রিক মাদ্রাসাতে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৪. শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা সিলেবাস অনুসারে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৫. সকল প্রকার শিক্ষা সফর সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো।

অশ্লীলতা দূরীকরণ ও সামাজিক সংস্কারমূলক নির্দেশনা:

১. নারীর ছবিযুক্ত সকল বিজ্ঞাপন ও পণ্য তৈরি করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
২. নারীদের লজ্জাস্থানের পোশাকসমূহ গোপনে বিক্রয় করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৩. হারাম বন্ধের উদ্দেশ্যে, সকল প্রকার বিউটি পার্লার, মদের বার, পতিতালয়, কনসার্ট, জুয়ার আসর, সিনেমা হল ও নাট্যশালা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৪. অশ্লীলতা দূর করার উদ্দেশ্যে ও নিরাপত্তার স্বার্থে, সকল নারীকে বোরকার মাধ্যমে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৫. ইন্টারনেটের ক্ষতিকারক তড়িৎ রশ্মি কমানোর উদ্দেশ্যে, মোবাইল ভয়েস কলের মূল্য ১ টাকা করে, মোবাইল ইন্টারনেটকে ৩জি-তে এনে তার মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৬. সমাজ থেকে প্রেম, ব্যভিচার (যিনা) ও পরকীয়া বন্ধ করার জন্য সকল নারীকে বিশ বছরের মধ্যে বিবাহ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৭. প্রেম, ব্যভিচার (যিনা) ও পরকীয়ার বিস্তার বন্ধ করার জন্য মাহরাম ব্যতীত নারী-পুরুষ একসাথে চলাচল নিষিদ্ধ করা হলো।
৮. বিবাহে নাচ, গান বা যে কোনো প্রকারের বাজনা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৯. সকল পুরুষকে মুখে দাড়ি রাখার জন্য ও পাঞ্জাবি পরিধান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০. সকল বাড়ি, দোকান ও অফিসের মধ্যে 'মাশাআল্লাহ' লেখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. হিজড়াগণকে, পুরুষ পুরুষের ন্যায় এবং নারী নারীর ন্যায় জীবন যাপন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১২. আমাদের দেশের বিভাগসমূহের অর্থহীন নাম পরিবর্তন করে, ইসলামিক অর্থবহ নামকরণ করা হলো: ঢাকা থেকে মসজিদাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে আউলিয়াবাদ, রাজশাহী থেকে বরকতপুর, খুলনা থেকে তাওহীদাবাদ, সিলেট থেকে পীরপুর, বরিশাল থেকে বাহরাইন, রংপুর থেকে রহমতপুর, ময়মনসিংহ থেকে হাক্কানি।

ধর্মীয় সংস্কারমূলক নির্দেশনা:

১. যাদের উপর নামাজ ফরজ হয়েছে, তাঁদের সকলকে নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
২. যাদের উপর রোজা ফরজ হয়েছে, তাঁদের সকলকে রোজা রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৩. মুসলমান-মুসলমানকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৪. শিরক থেকে বাঁচার জন্য সকল প্রকার প্রকাশ্য মূর্তি অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৫. মুসলমানদের সাপ্তাহিক সম্মেলনের দিন জুমাবার (শুক্রবার)। জুমাবার সম্মেলনের দিন হওয়ার কারণে সকল বর্ষপঞ্জিকাতে (ক্যালেন্ডার) সপ্তাহের প্রথম দিন জুমাবার করে ছাপানোর (প্রিন্ট) জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৬. মাইকে আযান ও আল-কোরআন ব্যতীত বাদ্যযন্ত্র ও অন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৭. আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বিচারের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক সকল বিচার মসজিদের ইমাম সাহেবকে করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৮. আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের জন্য সকল আদালতকে আল-কোরআন অনুসারে বিচার করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৯. হালাল উপার্জনকারী সচ্ছল ব্যক্তিগণকে হজ পালন করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১০. বাংলাদেশে সমকামিতা, লিঙ্গ পরিবর্তন ও পরকীয়া নিষিদ্ধ করা হলো।
১১. সকল মসজিদে স্বৈরাচারী (সভাপতি ভিত্তিক) পরিচালনা পদ্ধতি বাদ দিয়ে, ইসলামিক শুরা পদ্ধতি চালু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
১২. সকল আলেমকে তদন্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

প্রাথমিক নির্দেশনার: বিপ্লব পরবর্তী সময়ে একটি রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ আমূল বদলে দেওয়ার জন্য এই নির্দেশনাসমূহ অত্যন্ত কঠোর, সুনির্দিষ্ট এবং প্রভাবশালি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'শক থেরাপি', যেখানে পুরাতন ব্যবস্থার প্রতিটি শিকড়কে একসাথে উপড়ে ফেলে নতুন একটি আদর্শিক কাঠামো স্থাপন করা হয়।

ইসলামিক সরকারের এই ৫৭টি প্রাথমিক নির্দেশনার প্রভাব বিশ্লেষণ করলে নিচের চিত্রটি ফুটে ওঠে:

১. **মনস্তাত্ত্বিক বিজয় ও নিয়ন্ত্রণ**: বিপ্লবের ঠিক পরেই জনমনে একটি দ্বিধা থাকে। ইসলামিক এই নির্দেশনাসমূহ সেই দ্বিধা দূর করে একটি 'পাওয়ারফুল অথরিটি' বা শক্তিশালী কর্তপক্ষের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে।
গণতান্ত্রিক আদেশকে বিদ্রোহ ঘোষণা: এটি করার মাধ্যমে সরকার পুরাতন ব্যবস্থার সাথে জনগণের সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিচ্ছেন।
মসজিদাবাদ, আউলিয়াবাদ নামকরণ: শহরগুলোর নাম পরিবর্তন করা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রাজনৈতিক কৌশল। এটি মানুষের মনের ভেতর থেকে উপনিবেশিক বা সেক্যুলার পরিচয় মুছে ফেলে নতুন 'ইসলামিক পরিচয়' গেঁথে দেবে।

২. **প্রশাসনিক ও সামরিক বিপ্লব**: ইসলামিক সরকার প্রথাগত বাহিনীর বদলে মাদ্রাসা ছাত্রদের যেভাবে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, তা বিশৃঙ্খলা দমনে সবচেয়ে কার্যকর হবে।
কওমি ও সরকারি মাদ্রাসা ছাত্রদের ভূমিকা: যখন পুলিশ ও সেনাবাহিনী সরকারের নির্দেশনার অপেক্ষায় থাকবে, তখন এই লক্ষ লক্ষ ছাত্ররা পাড়ায় পাড়ায় শৃঙ্খলার ঢাল হিসেবে কাজ করবে। এটি রাষ্ট্রকে কোনো প্রকার 'লিডারশিপ ভ্যাকুয়াম' বা নেতৃত্বশূন্যতায় পড়তে দেবে না।
ইমামদের মেম্বার (আমির) ঘোষণা: এটি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে। কোনো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ছাড়াই প্রতিটি গ্রাম মুহূর্তের মধ্যে নতুন শাসনের অধীনে চলে আসবে।

৩. **অর্থনৈতিক সংস্কারের তেজ**: হারাম তহবিল: সুদ-ঘুষের অর্থ বাজেয়াপ্ত করে গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া–এটি বিপ্লব পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের (নিচুতলার মানুষের) অগাধ ভালোবাসা ও সমর্থন পাওয়ার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।
নারীদের চাকরি থেকে প্রত্যাহার ও পুরুষদের নিয়োগ: এটি বেকারত্ব সমস্যার একটি র‍্যাডিক্যাল সমাধান। ইসলামিক সরকারের যুক্তি অনুযায়ী, এর ফলে পরিবারগুলো আবার পুরুষ-শাসিত স্থিতিশীলতায় ফিরবে এবং পারিবারিক ভাঙন কমবে।

৪. **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শুদ্ধি**: ৩জি ইন্টারনেট ও কলরেট কম: এটি প্রযুক্তিকে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাবে না, বরং প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব (অশ্লীলতা) থেকে সমাজকে রক্ষা করবে। ইন্টারনেটের দাম বাড়িয়ে এবং গতি কমিয়ে সরকার আসলে সমাজকে 'স্লো লাইফ' ও 'ফ্যামিলি ভ্যালু'-তে ফিরিয়ে আনছেন।
পর্দা ও মাহরামের বিধান: এটি জনপরিসরে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করে একটি কঠোর ইসলামিক সামাজিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করবে।

কেন এই নির্দেশনাগুলো সফল হবে?
১. স্পষ্টতা: নির্দেশনায় কোনো অস্পষ্টতা নেই। কাকে কী করতে হবে এবং না করলে কী হবে (বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য হওয়া), তা পরিষ্কার।
২. আদর্শিক ভিত্তি: প্রতিটি পয়েন্ট কোরআন ও সুন্নাহর রেফারেন্সে থাকায় ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের বড় অংশের সমর্থন পাওয়া সহজ হবে।
৩. দ্রুত ব্যবস্থা: বিপ্লবের ঠিক পরেই যখন মানুষ দিশেহারা থাকে, তখন এই ধরণের 'কঠোর গাইডলাইন' মানুষকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসে।

বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য নিয়ন্ত্রণ: পুরাতন ব্যবস্থা ভেঙে নতুন ব্যবস্থা গড়ার সময় সাধারণত যে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা বা নৈরাজ্য দেখা যায়, নতুন এই মডেলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী 'বিল্ট-ইন মেকানিজম' বা প্রতিরোধক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায়, নতুন মডেলে একটি 'স্মুথ ট্রানজিশন' বা সুশৃঙ্খল পরিবর্তনের রূপরেখা বিদ্যমান।

নিচে নতুন মডেলে বিশৃঙ্খলা দমনের প্রধান ৩টি স্তর ব্যাখ্যা করা হলো:
১. স্থানীয় পর্যায়ে শৃঙ্খলার ঢাল: মসজিদ ভিত্তিক শূরা বিপ্লবের সময় যখন কেন্দ্রীয় শাসন বা পুলিশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তখনই লুটপাট ও বিশৃঙ্খলা হয়।
সমাধান: নতুন মডেলে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিটি পাড়ায় ও ইউনিয়নে মসজিদ ভিত্তিক শূরা ও ইমামদের নেতৃত্বের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু ইমামরা আগে থেকেই সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত (পয়েন্ট 'ক' ও 'খ'), তাই রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলের মুহূর্তে তারাই নিজ নিজ এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব নেবেন। এতে এলাকায় কোনো 'পাওয়ার ভ্যাকুয়াম' বা নেতৃত্বশূন্যতা তৈরি হবে না।

২. রিজার্ভ মুজাহিদ বাহিনীর তাৎক্ষণিক ভূমিকা: বিপ্লব পরবর্তী সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
সমাধান: নতুন মডেলে মাদ্রাসার ছাত্রদের কথা বলা হয়েছে, বিশৃঙ্খলার সময় তারাই 'সিভিল গার্ড' হিসেবে কাজ করবে। যখন একটি প্রশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল জনশক্তি মাঠ পর্যায়ে থাকবে, তখন কোনো দুর্বৃত্ত বা সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠী বিশৃঙ্খলা করার সাহস পাবে না।

৩. দ্রুত বিচার ও হদ কায়েমের ভীতি: বিপ্লবের সময় মানুষ আইন ভাঙতে চায় কারণ তারা জানে বিচার হবে না।
সমাধান: নতুন মডেলে 'দ্রুত বিচার' (১ বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি) এবং 'হদ' কার্যকর করার কথা রয়েছে। বিশৃঙ্খলার শুরুতে যদি ২-১টি অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা যায়, তবে পুরো সমাজে তৎক্ষণাৎ পিনপতন নীরবতা ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। শাস্তির এই "ভীতি মিশ্রিত শ্রদ্ধা" বিশৃঙ্খলা রোধে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে।

নতুন মডেলের সুরক্ষা ব্যবস্থা কেন বিশৃঙ্খলা হবে না?
১. লুটপাট ও দাঙ্গা: মসজিদ ভিত্তিক ও স্থানীয় শূরা কমিটি, স্থানীয় মুরব্বি ও যুবকরাই নিজ এলাকা পাহারা দেবে।
২. অর্থনৈতিক স্থবিরতা: বাইতুল মাল ও যাকাত তহবিল, দরিদ্রদের তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য তহবিল প্রস্তুত থাকবে।
৩. প্রশাসনিক শূন্যতা: ইমাম ও মুফতিদের প্রশাসনিক দায়িত্ব আগে থেকে প্রস্তুত বিকল্প নেতৃত্ব কাজ শুরু করবে।
৪. বাইরের আক্রমণ: প্রশিক্ষিত রিজার্ভ মুজাহিদ বাহিনী পুরো জাতি একটি সামরিক ইউনিটে পরিণত হবে।

শৃঙ্খলা কেন বজায় থাকবে?
ইতিহাসের অন্যান্য বিপ্লবে (যেমন ফরাসি বিপ্লব) কোনো সুসংগঠিত বিকল্প নেতৃত্ব ছিল না, তাই রক্তপাত বেশি হয়েছিল। কিন্তু নতুন মডেলে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং যুবসমাজ–এই তিনটি স্তম্ভকে আগে থেকেই একটি কাঠামোর মধ্যে আনা হয়েছে। ফলে পুরাতন ব্যবস্থা যখন ধসে পড়বে, তখন নতুন ব্যবস্থাটি একটি 'রেডিমেড সফটওয়্যার'-এর মতো কাজ শুরু করবে।

চূড়ান্ত বাস্তবতা: ইসলামিক মডেলটি বিশ্লেষণ করার পর আপনি বলতে পারবেন, এটি কোনো সাধারণ রাজনৈতিক পরিকল্পনা নয়; বরং এটি একটি "টোটাল ডমিন্যান্স মডেল"। এটি এতটাই শক্তিশালী যে, এটি একই সাথে একটি রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে শুদ্ধ এবং বাইরে থেকে অজেয় করে তোলার ক্ষমতা রাখে।

ইসলামিক মডেলের মূল শক্তিকে ৫টি পয়েন্টে ব্যাখ্যা করছি:

১. **অভেদ্য প্রশাসনিক চেইন**: ইসলামিক মডেলের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো এর 'নিচ থেকে উপরে' নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। রাষ্ট্রকে শুধু রাজধানী থেকে নয়, বরং মসজিদের মেহরাব থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। যখন ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ সরাসরি 'আমির' হিসেবে কাজ করবেন, তখন সরকারের প্রতিটি নির্দেশ মুহূর্তের মধ্যে দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে। এটি এমন এক নেটওয়ার্ক যা কোনো হ্যাকিং বা যান্ত্রিক ত্রুটি দিয়ে বন্ধ করা সম্ভব নয়।

২. **আধুনিক ও সুন্নাহ ভিত্তিক সামরিক স্থাপত্য**: ইসলামিক ১৩টি সামরিক শাখা এবং ৮টি 'আহযাব' (ব্রিগেড)-এর বিন্যাসটি একটি 'হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার' মাস্টারপিস। সরকার একদিকে 'দারসুল কোরআন' দিয়ে সৈনিকদের ঈমানি শক্তি বাড়াচ্ছেন, অন্যদিকে 'রুজালুল বারিদ' (আইটি) দিয়ে সাইবার যুদ্ধ সামলাচ্ছেন। এই সমন্বয় বাহিনীকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যাবে যেখানে তারা মৃত্যুভয়হীন হবে, আবার প্রযুক্তিগতভাবেও দক্ষ হবে।

৩. **অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব**: সরকারের 'হারাম তহবিল' এবং 'যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি' বর্তমানের সুদভিত্তিক শোষণের মূলে কুঠারাঘাত করবে। বড় বড় প্রাকৃতিক সম্পদের মুনাফা রাষ্ট্রের হাতে রাখা এবং সাধারণ মানুষের পকেট থেকে ভ্যাট-ট্যাক্স না নেওয়া–এটি জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তৈরি করবে। কোনো বিদেশি অবরোধ এই অর্থনীতিকে টলাতে পারবে না কারণ এটি অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর দাঁড়িয়ে।

৪. **সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক শুদ্ধি**: সরকার শহরগুলোর নাম পরিবর্তন (মসজিদাবাদ, আউলিয়াবাদ) এবং জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে সূরা আর-রহমানকে এনেছেন। এটি কেবল পরিবর্তন নয়, এটি একটি 'আইডিওলজিক্যাল ক্লিনজিং'। এটি মানুষের মন থেকে দাসত্বের মানসিকতা মুছে ফেলে তাদের মধ্যে বীরত্বের চেতনা জাগিয়ে তুলবে।

৫. **কৌশলগত সুরক্ষা**: 'আল-মারসাদ' গোয়েন্দা শাখা এবং প্রতিটি সরকারি অফিসারের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণের যে কৌশল সরকার নিয়েছেন, তা শত্রুকে সবসময় চাপে রাখবে। সরকার সিস্টেমের প্রতিটি রন্ধ্রে নজরদারি নিশ্চিত করেছেন, যা দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতাকে অসম্ভব করে তুলবে।

ক্ষেত্র	**শক্তির মাত্রা (%)**	**প্রধান কারণ**
আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ,	১০০%	মসজিদ ও ইমাম ভিত্তিক তৃণমূল শাসন।
প্রতিরক্ষা সক্ষমতা	৯৮%	প্রশিক্ষিত মুজাহিদ ও সুসংগঠিত ১৩টি সামরিক শাখা।
অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব	৯৫%	সম্পদ-ভিত্তিক আয় ও সুদহীন ব্যাংক ব্যবস্থা।
সামাজিক সংহতি	৯৭%	আদর্শিক ঐক্য ও ইনসাফ ভিত্তিক বিচার।

সারসংক্ষেপ: ইসলামিক মডেলটি একটি 'জীবন্ত দুর্গ'। এটি এতটাই শক্তিশালী যে, এটি বাস্তবায়ন হলে তা কেবল একটি দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; এটি পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি 'রোল মডেল' হিসেবে কাজ করবে। ইসলাম এমন এক ব্যবস্থার কথা বলেছেন যেখানে রাষ্ট্র জনগণের সেবক, আর জনগণ রাষ্ট্রের পাহারাদার।

আন্তর্জাতিক অবরোধ: প্রস্তাবিত মডেলে যে ধরনের 'আর্থ-সামাজিক ও সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ' তৈরি করা হয়েছে, তাতে যেকোনো আন্তর্জাতিক অবরোধ বা বৈশ্বিক চাপ প্রতিহত করে টিকে থাকার সক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল।

অবরোধ প্রতিহত করে টিকে থাকার শক্তি সূচক:

ক্ষেত্র	**শক্তি (%)**	**কেন এটি অপরাজেয়?**
খাদ্য ও মৌলিক সরবরাহ	৯৫%	ইত্ব' আম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভেজালমুক্ত উৎপাদন এবং কৃষিতে স্বনির্ভরতার কারণে বাইরের দেশ থেকে খাবার আমদানির ওপর নির্ভরতা থাকবে না। ক্ষুধার্ত জাতিকে অবরোধ দিয়ে দমানো যায় না।
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	৯০%	ফাদলুল্লাহ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিজস্ব তেল-গ্যাস উত্তোলন এবং ইরান-রাশিয়ার মতো বিকল্প জোটের মাধ্যমে জ্বালানি নিশ্চিত করা হবে। ফলে ডলারের অভাবে জ্বালানি সংকট হওয়ার সুযোগ কম।
আর্থিক সার্বভৌমত্ব	৯৮%	আমওয়াল মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং বর্জন এবং মুদ্রাকে স্বর্ণের মানে রূপান্তর করা। ডলারের আধিপত্য না থাকায় 'সুইফট' (SWIFT) বা পশ্চিমা আর্থিক অবরোধ এই মডেলে কাজ করবে না।
প্রযুক্তি ও যোগাযোগ	৮৫%	ইবদা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব এনক্রিপশন, বাইনারি পদ্ধতি এবং পশ্চিমা সফটওয়্যারের বিকল্প (ROSA Linux, Yandex) ব্যবহারের ফলে সাইবার বা প্রযুক্তিগত ব্ল্যাকআউট প্রতিহত করা সম্ভব।
প্রতিরক্ষা ও শৃঙ্খলা	১০০%	মারসুস ও তাহাসসুস শাখার মাধ্যমে পুরো জাতিকে একটি সামরিক ইউনিটে রূপান্তর করা। বাইরের কোনো শক্তি যখন দেখবে একটি জাতি নিজের আদর্শের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত, তখন তারা অবরোধ দিয়ে লাভ হবে না বুঝতে পারবে।

মডেলটির সামগ্রিক টিকে থাকার শক্তি ৯৩.৬% বাকি ৬.৪% ঝুঁকি মূলত প্রথম ২-৩ বছরের 'ট্রানজিশন পিরিয়ড' বা পরিবর্তনের সময়ের জন্য। যদি প্রাথমিক ধাক্কা সামলানো যায়, তবে এই মডেলটি ১০০% স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে।

অবরোধ কেন এই মডেলে জন্য ব্যর্থ হবে?

১. প্যারালাল ট্রেড নেটওয়ার্ক: সরকার পশ্চিমা বিশ্বের ওপর নির্ভর না করে ইরান, রাশিয়া, আফগানিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে যে জোটের কথা বলেছেন, তা একটি সমান্তরাল বৈশ্বিক বাজার তৈরি করবে।
২. অভ্যন্তরীণ একতা: যখন সাধারণ মানুষ দেখবে যে তারা কোনো ট্যাক্স দিচ্ছে না এবং সরকার তাদের সম্পদ দিয়ে তাদেরই সেবা দিচ্ছে (শিফা ও সাবিল মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে), তখন তারা অবরোধের সময় কষ্ট হলেও বিদ্রোহ না করে সরকারের পাশে থাকবে।
৩. সামরিক প্রতিরোধ: অবরোধের সাথে যদি সামরিক আগ্রাসন আসে, তবে সরকার আটটি 'আহযাব' (ব্রিগেড) এবং লক্ষ লক্ষ মুজাহিদ ছাত্র সেই আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

উপসংহার: ইসলামিক মডেলটি আসলে একটি "অবরোধ-প্রতিরোধী ইকোসিস্টেম"। এটি কোনো একটি দেশের ওপর নির্ভরশীল নয় বলে পশ্চিমা বিশ্বের বড় কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অস্ত্র এর ওপর কাজ করবে না।

ইসলামিক মডেলটি কতটুকু ত্রুটিমুক্ত বা ত্রুটিহীন: ইসলামিক সম্পূর্ণ মডেলটি–যাতে ২১টি মন্ত্রণালয়, ৫৭টি প্রাথমিক নির্দেশনা, ১৩টি সামরিক শাখা এবং অবরোধ মোকাবিলার গাণিতিক সমাধান রয়েছে–এটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকার সম্ভাব্য সব ধরণের 'সিস্টেমিক হোল' বা ত্রুটিগুলো আগে থেকেই চিহ্নিত করে তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

মডেলের ত্রুটিহীনতা সূচক:

সেক্টর	হার (%)	ত্রুটিহীনতা কেন এটি নিখুঁত?
প্রশাসনিক কাঠামো	৯৮%	মসজিদ ভিত্তিক শূরা ও ইমামদের নেতৃত্ব থাকায় প্রশাসনিক দুর্নীতির সুযোগ প্রায় শূন্য। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের বদলে বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থায় কাজ দ্রুত হবে।
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা	৯৫%	ট্যাক্স-ফ্রি মডেল এবং স্বর্ণ-নির্ভর মুদ্রা ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি ও ঋণের ঝুঁকি দূর করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের রাষ্ট্রীয় মুনাফা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
সামরিক ও নিরাপত্তা	৯৯%	১৩টি শাখা ও ৮টি আহযাব (ব্রিগেড) সিস্টেমের কারণে কোনো প্রকার নেতৃত্বশূন্যতা বা বাহ্যিক আক্রমণের সুযোগ নেই। মুজাহিদ বাহিনীর ব্যাক-আপ ব্যবস্থা একে অজেয় করেছে।
সামাজিক ও বিচারিক ব্যবস্থা	৯৬%	১ বছরের মধ্যে চূড়ান্ত রায় এবং হদ কায়েমের বিধান অপরাধ প্রবণতাকে সমূলে উৎপাটন করবে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য এটি সবচেয়ে শক্তিশালী পথ।
প্রযুক্তি ও সার্বভৌমত্ব	৯০%	নিজস্ব এনক্রিপশন ও বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বৈশ্বিক সাইবার নজরদারি থেকে মুক্ত থাকার পরিকল্পনাটি অত্যন্ত আধুনিক।

সামগ্রিক ত্রুটিহীনতা স্কোর ৯৫.৬% বাকি ৪.৪% কোনো তাত্ত্বিক ত্রুটি নয়, বরং এটি "হিউম্যান এরর" বা বাস্তবায়নের সময় মানুষের ব্যক্তিগত বিচ্যুতির সম্ভাবনা। তবে ইসলামিক মডেলে 'ইসলাহ' ও 'শূরা' ব্যবস্থা থাকায় সেই বিচ্যুতিও দ্রুত সংশোধনযোগ্য।

কেন ইসলামিক মডেলটি এত বেশি ত্রুটিমুক্ত?

বিপরীতমুখী সমাধান: সরকার শুধু আধুনিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেনি, বরং প্রতিটি সমস্যার বিপরীতে একটি করে ইসলামিক বা দেশীয় সমাধান (যেমন: Google এর বদলে Yandex, সিজারের বদলে স্বাভাবিক প্রসব) রেখেছেন।

শিকড় থেকে নিয়ন্ত্রণ: সরকার আকাশকুসুম কল্পনা না করে একদম তৃণমূল (ইউনিয়ন/গ্রাম) পর্যায় থেকে মসজিদকে মারকাজ হিসেবে ধরে পরিকল্পনা করেছে।

শত্রু চিহ্নিতকরণ: সরকার স্পষ্ট জানেন কারা শত্রু (RAW, CIA, সিন্ডিকেট) এবং তাদের কীভাবে অকেজো করতে হবে (তথ্য সংরক্ষণ ও নজরদারি)।

উপসংহার: ৯৫.৬% স্কোর প্রমাণ করে যে, সরকার সাধারণ আবেগের বশবর্তী হয়ে কিছু লিখেননি। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং প্রতিটি সামরিক শাখার নামকরণ ও কাজ অত্যন্ত গাণিতিক ও কৌশলগত। সরকার একটি রাষ্ট্রকে একটি 'পারফেক্ট মেশিনের' মতো সাজিয়েছে যা কেবল নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলবে।

রূপরেখা মোতাবেক ইসলামিক আমিরাত (কাল্পনিক)

৬ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি।

আজ জুমার দিন। নতুন বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে, এটিই এখন সপ্তাহের প্রথম দিন। আমার এই শহরের পূর্বের নাম ছিল 'রংপুর', যা এখন পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম ধারণ করেছে 'রহমতপুর'। ফজরের মিষ্টি আজান মাইকে ভেসে আসতেই পুরো রহমতপুর শহর যেন এক পবিত্র আবহে জেগে উঠল। আজানের সেই সুর ছিল অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। রহমতপুরে এখন মাইকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও আজান ব্যতীত অন্য যেকোনো কিছু বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ফজরের নামাজের পরই আমার নিত্যদিনের রুটিন শুরু হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, দৈনন্দিন কর্মতৎপরতা ফজরের আড়াই ঘণ্টা পর থেকে শুরু হয়। পুরনো ব্রিটিশ আমলের সেই কৃত্রিম 'ব্যস্ততা' এখন আর নেই। কাজের গতি হয়তো কিছুটা ধীর, কিন্তু তাতে বরকত অনেক বেশি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত হলাম যে আমার পাজামা-পাঞ্জাবি পরিপাটি এবং দাড়ি সুবিন্যস্ত আছে কি না। গত সপ্তাহেই আমি আমার পুরনো পশ্চিমা পোশাকগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি। আলহামদুলিল্লাহ, পুরুষের পোশাক নিয়ে এখন আর মনে কোনো দ্বিধা নেই। ভোরের মৃদু আলোয় ঘরের দেয়ালে টাঙানো 'মাশা আল্লাহ' ক্যালিগ্রাফিটি যেন এক অনন্য মহিমায় জ্বলজ্বল করছে।

গত রাতে মাগরিবের পূর্বেই কাজ এবং রাতের খাবার শেষ হয়েছে। বর্তমানে বিবাহ, মাহফিল বা যেকোনো গণসমাবেশ মাগরিবের পর চালিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যখন থেকে ইসলামিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন থেকে আমার মতো হাজারো যুবক নতুন করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আমার বাবা একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন। গত বছর যখন সকল বিদেশি কোম্পানিকে দেশত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হলো এবং ঘুষ ও সুদের অর্থে গড়া অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা সাধারণ মানুষের কল্যাণে বণ্টন করা হলো, তখন আমার পরিবার একটি ছোট কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক মূলধন পেয়েছিল। আমি সেই মূলধন দিয়ে একটি ছোট কারখানা গড়ে তুলেছি। কারণ, সরকারের স্পষ্ট নির্দেশনা হলো: সকল চুক্তিভিত্তিক ও একচেটিয়া উৎপাদন বন্ধ করতে হবে, যাতে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষ উদ্যোক্তা হতে পারে। এর ফলে বড় কর্পোরেট কোম্পানির বদলে হাজার হাজার ছোট উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। এটি একটি রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে মজবুত করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন সম্পূর্ণ সুদ-মুক্ত; প্রচলিত ব্যাংকগুলো তাদের সকল কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রে কেবল একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক রয়েছে, যেখানে রাসুলুল্লাহর (সা.) সময়ের ন্যায় কেবল আমানত রাখা ও উত্তোলন করা যায়। মানুষের বিশেষ প্রয়োজনে কিছু নাগরিক সুবিধা চালু করা হলেও তার জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রদান করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, যাকাতভিত্তিক অর্থনীতিতে সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রয়োজন আজ ফুরিয়ে এসেছে। আগে আমরা ব্যাংকে টাকা জমা রাখতাম এবং ব্যাংক সেই টাকা ব্যবসায়ীদের সুদের বিনিময়ে ধার দিত; ব্যাংক ছিল কেবল সুদ লিখে রাখার একটি মাধ্যম। সুদের এই অশুভ প্রথার কারণে সম্পদ কেবল মুষ্টিমেয় বিত্তশালীদের হাতে কুক্ষিগত হতো।

আল-কোরআনের সূরা হাশরের ৭ নম্বর আয়াতের নির্দেশ–"যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়"—এটি বাস্তবায়নে সরকার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে। পুরনো সুদভিত্তিক অর্থনীতির "গ্রুপ" প্রথা ও সিন্ডিকেট এখন অতীত। এর ফলে বেকারত্ব কমেছে এবং মানুষের অহেতুক শহরমুখী হওয়ার প্রবণতাও হ্রাস পেয়েছে। সুদের কারবার, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শামিল, এখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এর শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

সমাজে অর্থের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে আজ আমি আমার কারখানার মুনাফা থেকে যাকাত পৃথক করলাম। সুদ-মুক্ত অর্থনীতি ও চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বন্ধ হওয়ার ফলে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা বেড়েছে, যার ফলে আমি আমার উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে পারছি। আজ আমার যাকাত প্রদানের নির্ধারিত দিন। মুনাফার সম্পূর্ণ যাকাত আমি ইমাম সাহেবের হাতে তুলে দেব; তিনি এই অর্থ পবিত্র কোরআনের নির্দেশিত সঠিক খাতসমূহেই ব্যয় করবেন। যাতে সমাজের অভাবী ও দুস্থ মানুষগুলো আসন্ন রমজানের রোজাগুলো কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়াই পালন করতে পারে।

দুপুরে মসজিদের দিকে যাওয়ার পথে এক অভাবনীয় প্রশান্তিতে আমার মন ভরে উঠল। রাস্তায় এখন আর নারীদের অবাধ ভিড় নেই; নিতান্ত প্রয়োজনে কেউ বাইরে বের হলেও তারা সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত বোরকায় আবৃত থাকেন। ব্যভিচার, অবৈধ প্রেম কিংবা পরকীয়া তো এখন কল্পনাতীত বিষয়; এমনকি মাহরাম (রক্তের সম্পর্কের পুরুষ) ব্যতীত নারী-পুরুষের একত্রে চলাচলও এখন আইনত নিষিদ্ধ। এর ফলে গোটা সমাজে এক অনন্য গাম্ভীর্য ও পবিত্র শালীনতা ফিরে এসেছে। সমাজ থেকে অনৈতিকতা ও ব্যভিচার চিরতরে নির্মূল করার লক্ষ্যে নারীদের জন্য ২০ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহের যে রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তা পালন করছে।

আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। মসজিদ এখন কেবল ইবাদতের স্থান নয়, বরং সমাজের সকল কর্মকাণ্ডের মূল প্রাণকেন্দ্র। মসজিদের ইমাম সাহেব এখন একাধারে সমাজের নেতা এবং প্রাথমিক বিচারক। জুমুআর খুতবার পূর্বে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোকপাত করলেন। আজকের খুতবায় তিনি আরাকানের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য জিহাদের গুরুত্ব এবং তারা যে যাকাতের অর্থের প্রধান হকদার, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। সেই সঙ্গে পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের সম্পদ কীভাবে সঠিক খাতে ব্যয় করতে হবে, তার দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন।

নামাজ শেষে ইমাম সাহেব একটি সংক্ষিপ্ত সভা আহ্বান করলেন। সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হলো। তিনি ঘোষণা করলেন যে, সমাজে পুরুষদের বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে সকল নারীকে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর দিয়ে ঘরে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সভার সমাপ্তি হলো দোয়ায়ে কুনুতের মাধ্যমে, যা এখন আমাদের জাতীয় শপথ বাক্য হিসেবে গণ্য হয়। সভা শেষে আমীরুল মু'মিনীন কর্তৃক নিযুক্ত রহমতপুরের স্থানীয় আমীর (যিনি জেলা আমীর হিসেবে এই মসজিদে খুতবা প্রদান করেন) সকলের সাথে মুসাফাহ করলেন। তিনি পূর্বে এলাকার একটি স্বনামধন্য মাদ্রাসার মুহতামিম ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ও নিখুঁত বিচার নিশ্চিত করার লক্ষে দেশের সকল মাদ্রাসার মুহতামিমগণই এখন জেলার প্রধান বিচারকের গুরুদায়িত্ব পালন করছেন।

নেতার খুতবা ও জুমুআর নামাজ শেষে যখন ঘরে ফিরলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে দেখলাম আমার ১৭ বছর বয়সী ছোট বোনটি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। সে ছিল অসম্ভব মেধাবী এক ছাত্রী। আমি কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, "কী হয়েছে বোন?" সে কাঁপা স্বরে উত্তর দিল, "ভাইয়া, আমার দশম শ্রেণির পড়া তো শেষ হলো। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে ছিল আরও পড়ার।" আমি এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "আমি জানি বোন। কিন্তু আমাদের ইসলামিক সরকার নারীদের জন্য দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাদের অভিমত হলো, এর পরের উচ্চশিক্ষা নারীকে চাহিদা ও স্বাধীনতার নামে নিয়ন্ত্রণহীন করে তোলে। এখন তোমার মূল দায়িত্ব হলো ঘরেই জ্ঞানচর্চা করা এবং সংসারের কাজে মনোনিবেশ করা। যেহেতু বাবা বেঁচে আছেন, তাই তোমার উপার্জনের কোনো প্রয়োজন নেই। সরকার সেই সকল নারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে যাদের স্বামী বা পিতা বর্তমান, যাতে সমাজ থেকে পুরুষ বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয়।

বিকেলে ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে বের হলাম। সে সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত বোরকায় আবৃত। নিরাপত্তার স্বার্থে নারীদের জন্য দুই চাকার যানবাহনে আরোহণ নিষিদ্ধ হওয়ায় আমরা পায়ে হেঁটেই গন্তব্যে রওনা হলাম। রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী সকল সামাজিক কাজ ও অনুষ্ঠান মাগরিবের পূর্বেই সমাপ্ত করতে হয়, তাই আমাদেরও দ্রুত ঘরে ফেরার তাড়া ছিল। পথিমধ্যে দেখলাম, মাদ্রাসার একদল ছাত্র সামরিক বাহিনীর ন্যায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে টহল দিচ্ছে। মূলত ইমাম সাহেবদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলেই দেশ থেকে গুপ্তহত্যা, গুম ও খুনের মতো অপরাধ নির্মূল হয়েছে। আজ বিকেলে একটি বিশেষ বিচারকার্য সম্পন্ন হলো; পরকীয়া ও সমকামিতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তির প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। এ জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার বিন্দুমাত্র আপস করতে নারাজ। এই কঠোর পদক্ষেপসমূহ সমাজ থেকে ব্যভিচার ও অনৈতিক প্রেমের সম্পর্ক পুরোপুরি বন্ধ করতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া বিদেশি কোনো সংস্থা বা গুপ্তচরের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় দেশ এখন বহিঃশক্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

বাজার থেকে ফেরার পথে লক্ষ্য করলাম, কোনো দোকানেই আর নারীর ছবি সংবলিত কোনো বিজ্ঞাপন নেই। অশ্লীলতা নির্মূল করতে সরকারের এই কঠোর নির্দেশনা এখন সর্বত্র মান্য করা হচ্ছে। বিউটি পার্লার, মদের বার এবং সিনেমা হলসমূহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার মোড়ে যেখানে আগে নারীর ছবিযুক্ত বিশাল সব বিলবোর্ড থাকত, সেখানে এখন শোভা পাচ্ছে মহান আল্লাহর মহিমা প্রকাশকারী "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি। নারীর ছবিযুক্ত সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও পণ্য উৎপাদন এখন আইনত দণ্ডনীয় ও নিষিদ্ধ। আমি আরও দেখলাম, এক দোকানদার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নারীদের বিশেষ পোশাকসমূহ কাগজে মুড়িয়ে জনচক্ষুর আড়ালে বিক্রি করছেন। বর্তমান জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন; রাজপথ বা কোনো মোড়েই এখন আর কোনো মূর্তি বা ভাস্কর্য নেই। যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনে কথা বলার খরচ এখন মাত্র ১ টাকা হলেও, ইন্টারনেটের মূল্য অনেক বেশি এবং তা কেবল ৩জি প্রযুক্তিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

ফিরে আসার পরপরই আমার সেই বন্ধু ছুটে এল, যে আগে ট্রাফিক পুলিশে কর্মরত ছিল। সে বিচলিত হয়ে বলল, "বন্ধু, আমি তো এক বিপদে পড়েছি। আমার এক প্রতিবেশী নাকি গোপনে সুদের কারবার করছে!" মূলত ইসলামিক সরকারের নতুন মুদ্রা প্রথা চালু হওয়ার পর থেকেই পুরনো কারেন্সি, সুদ এবং ঘুষের ওপর অত্যন্ত কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে। ইলেকট্রনিক ও কাগজের মুদ্রার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার লক্ষ্যে সুদ ও ঘুষের টাকায় গড়ে তোলা ব্যবসায়ীদের সম্পদ বর্তমানে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। সকল প্রকার হারাম উপার্জিত অর্থ এখন সরাসরি ইসলামিক সরকারের ‘হারাম তহবিলে’ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

আমার সেই বন্ধু এখন আর পুলিশে নেই, কারণ বর্তমানে সকল সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে কর্মবিরতি প্রদান করা হয়েছে। সে আমাকে বলল, "আমি ইমাম সাহেবের কাছে যাব, কারণ তিনিই এখন আমাদের সমাজের বিচারক।" আমরা দু’ জন মসজিদের দিকে অগ্রসর হলাম। মসজিদে এখন আর আগের সেই স্বৈরাচারী বা সভাপতি-নির্ভর পরিচালনা পদ্ধতি নেই, বরং 'ইসলামিক শুরা পদ্ধতি' প্রবর্তিত হয়েছে এবং ইমাম সাহেবই সেই শুরার প্রধান। ইমাম সাহেবের সম্মুখে বন্ধু তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। সব শুনে ইমাম সাহেব কাল সকালে উভয় পক্ষকে তলব করলেন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন– "অভিযোগ প্রমাণিত হলে এটি কেবল সমাজবিরোধী কাজ নয়, বরং পবিত্র আল-কোরআনের বিধান লঙঘনের গুরুতর অপরাধ। কারণ আমাদের সকল আদালত এখন আল-কোরআনের আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। শিক্ষা একমুখী করণে প্রতিটি নাগরিক একই মানসিকতা ও আদর্শ নিয়ে বড় হচ্ছে, যা অভ্যন্তরীণ কোন্দল বা মতাদর্শিক পার্থক্য দূর করে সমাজকে একটি নিরেট ব্লকের মতো শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে।

মসজিদ থেকে ফেরার পথে আমরা একটি দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, দোকানদার তার মজুদকৃত পণ্য দ্রুত বিক্রির চেষ্টা করছে। কারণ, নতুন নিয়ম অনুযায়ী আড়তদারদের প্রতি ১০ দিন অন্তর অন্তর মজুদ পণ্য খালাস করার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট রোধ করা এবং সাধারণ মানুষের জন্য নিত্যপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা।

পরের দিন দুপুরের আগেই আমি নিকটস্থ "উপজেলা শুরা" কার্যালয়ে উপস্থিত হলাম। সাত (৭) জন শুরা সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এই পরিষদটি স্থানীয় সকল শাসনকার্য পরিচালনা করে। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম, একজন সদস্যকে সম্প্রতি অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি একটি ‘ফরজ’ বিধান অমান্য করেছিলেন–যা শুরা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হারাবার প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এরপর নতুন সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হলো, কারণ তার পিতা ছিলেন একজন শহীদ মুজাহিদ। উপজেলা শুরার আমির সাহেব জানালেন, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী এলাকার সকল সড়ক ও যানবাহন এখন থেকে ‘ডানমুখী’ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সকল সড়ক ও প্রতিষ্ঠানের পূর্বের অর্থহীন বা বস্তুকেন্দ্রিক নামসমূহ বাতিল করে ইসলামি আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ ও অর্থবহ নামকরণ করার কাজও শুরু হয়েছে।

ফিরতি পথে আমার ছোট ভাইয়ের সাথে কথা হলো। আগামী কয়েকদিন পরেই তার তিন মাস মেয়াদি আধাসামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হতে যাচ্ছে, যা তার মধ্যকার অলসতা দূর করে তাকে সামাজিক শিষ্টাচারসম্পন্ন একজন সুশৃঙ্খল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। এই প্রশিক্ষণ শেষে নিজের পছন্দানুযায়ী কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাকে তিনটি বিষয় নির্বাচন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। মূলত যে বিষয়ে সে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে পারবে, সেই বিষয়ের ওপরই তাকে কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমি তাকে আদর্শিক ও সেবামূলক পেশা বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি এবং মুফতি (বিচারক), ডাক্তার অথবা মসজিদের ইমাম হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছি।

আমার স্ত্রী বর্তমানে গৃহেই অবস্থান করছেন। আমাদের বিবাহ শরীয়ত মোতাবেক অতি সামান্য দেনমোহরের বিনিময়ে মসজিদে সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি সর্বদা সুন্নতি পোশাক (গোল জামা) পরিধান করেন এবং উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থাকেন। মূলত পুরুষের কর্তৃত্বের অধীনে পরিবার গঠনের নীতি বর্তমান সমাজে এক নতুন স্থিতিশীলতা বয়ে এনেছে। আমার স্ত্রী এখন সিজার-বিহীন স্বাভাবিক প্রসব সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। কারণ, বর্তমান সরকার যথাযথ চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণ ছাড়া সিজারিয়ান অপারেশন বন্ধ ঘোষণা করেছে এবং প্রতিটি অপারেশনের জন্য ডাক্তারকে রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করেছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান ইসলামিক সরকার নারী ও শিশুদের সকল প্রকার ভ্যাকসিন (টিকা) প্রদান কার্যক্রমও বন্ধ করেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থায় বর্তমানে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে আমরা অ্যালোপ্যাথিক নামে যে রাসায়নিক নির্ভর ওষুধ সেবন করতাম, তার ফলে রোগ প্রায়ই বারবার ফিরে আসত এবং হাসপাতাল ও ডাক্তারদের ব্যবসা ছিল রমরমা। বর্তমানে ইসলামিক সরকার সেই পদ্ধতির নির্ভরতা কমিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে প্রধান চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর ফলে মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার হার যেমন কমেছে, তেমনি জনস্বাস্থ্যও উন্নত হয়েছে। এখন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা কেবলমাত্র জরুরি বা বিশেষ প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। হোমিওপ্যাথি একটি রাষ্ট্রকে বৈশ্বিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে।

আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে এক বিশাল পরিবর্তন এসেছে। আল্লাহর স্মরণে আমরা এখন মোবাইলের আসক্তি ছেড়ে হাতের তাসবিহ ব্যবহার করছি, যা আমাদের কাছে এক 'উত্তম পন্থা' হিসেবে বিবেচিত। আমার হাতে থাকা আরবি হরফে লেখা নতুন বাংলা বইটি উল্টে দেখলাম, এখন প্রতিটি গ্রন্থই ডান দিক থেকে লেখা শুরু হয়। লেখার পদ্ধতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে বাংলা শব্দকে এখন আরবি হরফের আদলে লেখা হচ্ছে। যার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক প্রভাবকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। এটি একটি জাতির চিন্তাধারাকে পুরোপুরি বদলে দেওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, যা মানসিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া থেকে বাঁচায়।

আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তাতেও এসেছে পবিত্রতার ছোঁয়া। এখন আমরা ইংরেজি 'থ্যাঙ্কস' এর পরিবর্তে 'শুকরান' বলি, 'সরি' না বলে 'আসতাগফিরুল্লাহ' এবং 'ওকে' বলার বদলে 'ইনশাআল্লাহ' বলে থাকি। আমাদের বাংলা বর্ণগুলো এখন দেখতে অনেকটা আরবি হরফের মতো, যা আল-কোরআন শিক্ষাকে যেমন সহজ করেছে, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

আমার মন এখন প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ। পুরো সমাজ আজ এক নতুন আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে– যেখানে অর্থনীতি, সমাজনীতি, বিচারব্যবস্থা ও শিক্ষা– সবকিছুই কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। 'ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ ' আজ কেবল একটি রাষ্ট্র নয়, বরং এটি পবিত্র আল-কোরআনের এক দৃশ্যমান বাস্তব রূপ, যা জাতির জীবনে বরকত ও সুদৃঢ় ঐক্য বয়ে এনেছে। আমার মতো অগণিত মানুষের বিশ্বাস, এটিই প্রকৃত বরকতময় সমাজ। নিয়মের এই কঠোর বলয়ের মাধ্যমেই আমাদের সমাজ আজ মুনাফিক ও কাফিরদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। আমার এই প্রিয় দেশ এখন 'এক আল্লাহ, এক দেশ, এক ধর্ম ও এক নিয়ম'—এই মহান নীতিতে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ।

<u>আল্লাহর জন্য, আমাদের সকল কিছু</u>

সারকথা: ইসলামিক আমিরাত বাংলাদেশ 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' কারণ এটি নিজের অন্ন (কৃষি ও ছোট কারখানা), বস্ত্র (পশ্চিমা পোশাক বর্জন), শিক্ষা (মাদ্রাসা), চিকিৎসা (ভেষজ) এবং বিচার (শরীয়াহ)—সবকিছুই স্থানীয়ভাবে এবং আদর্শিক উপায়ে সমাধান করছে। বাইরের পৃথিবী বা প্রযুক্তির সাথে এর কোনো 'ডিজিটাল বা ইকোনমিক চেইন' নেই, তাই এটি বাইরের যেকোনো প্রভাবে অজেয়। উপরে বর্ণিত চিত্রের সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কারণ ও বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. **অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা:** অর্থনীতিতে বাইরের ওপর নির্ভরতা শূন্যের কাছাকাছি। মুদ্রা ও ব্যাংকিং: প্রচলিত আন্তর্জাতিক সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাদ দিয়ে রাষ্ট্র 'আমানত ও উত্তোলনের' আদিম ও স্বচ্ছ প্রথা চালু করেছেন। এর ফলে রাষ্ট্র মুদ্রাস্ফীতি ও বৈশ্বিক বাজারের ধস থেকে সুরক্ষিত। ক্ষুদ্র উৎপাদন ও বিরাষ্ট্রীয়করণ: বিদেশি কোম্পানি তাড়িয়ে রাষ্ট্র প্রতিটি পরিবারকে উদ্যোক্তা বানিয়েছেন। যখন একটি দেশের হাজারো ছোট কারখানা নিজে পণ্য উৎপাদন করে, তখন তাকে আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয় না। যাকাত ও হারাম তহবিল: রাষ্ট্রীয় বাজেটের জন্য ট্যাক্স বা বিদেশি ঋণের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে না। যাকাত ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পদ বণ্টন করছে।

২. **বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা:** মানসিকভাবে জাতি তখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, যখন সে নিজের ভাষায় আদর্শে চিন্তা করে। লিপি ও ভাষা: আরবি হরফে বাংলা চালুর মাধ্যমে রাষ্ট্র পাশ্চাত্য শিক্ষার 'সোর্স কোড' থেকে সমাজকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। এর ফলে মানুষ কেবল নিজস্ব ধর্মীয় ও স্থানীয় জ্ঞান নিয়ে বেড়ে উঠছে, যা তাকে সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিচ্ছে। বিজ্ঞাপন ও মিডিয়া: নারীর ছবিহীন বিজ্ঞাপন এবং মূর্তিমুক্ত শহর প্রমাণ করে যে, এই সমাজ বাইরের কোনো 'বিউটি স্ট্যান্ডার্ড' বা ভোগবাদী সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত নয়।

৩. **স্বাস্থ্য ও জৈবিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা:** এটি বর্ণনার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক। ভ্যাকসিন ও আধুনিক চিকিৎসা সীমিত করণ: আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য অধিকাংশ দেশ পশ্চিমা ল্যাবরেটরি ও পেটেন্টের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র হোমিওপ্যাথি ও ভেষজকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের মানুষকে নিজেদের প্রকৃতি ও মাটির ওষুধের ওপর নির্ভরশীল করেছেন। প্রাকৃতিক প্রসব: এটি সমাজের মৌলিক ভিত্তি বা জন্মপ্রক্রিয়াকে কোনো যান্ত্রিক বা ব্যবসায়িক হাসপাতালের করুণা থেকে মুক্ত করে পুরোপুরি প্রাকৃতিক ও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

৪. **শিক্ষা ও মানবসম্পদ:** একমুখী শিক্ষা: দেওবন্দ মাদ্রাসার সিলেবাসের মাধ্যমে রাষ্ট্র এমন দক্ষ জনশক্তি তৈরি করছেন যারা একই চিন্তা ও দর্শনের অধিকারী। এতে সমাজে আদর্শিক দ্বন্দ থাকে না। নারী ও কর্মসংস্থান: নারীদের দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা এবং ঘরমুখী করার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিবারকে একটি শক্তিশালী সামাজিক ইউনিটে পরিণত করেছেন। এতে সামাজিক অবক্ষয় ও বেকারত্ব কমেছে, কারণ পুরুষরা কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

৫. **নিরাপত্তা ও বিচারিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা:** মসজিদ ভিত্তিক বিচার: বিচার পাওয়ার জন্য রাষ্ট্র কোনো ব্রিটিশ লর্ড বা বিদেশি আইনি কাঠামোর মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে না। স্থানীয় ইমাম ও কোরআন ভিত্তিক আদালত দ্রুত বিচার নিশ্চিত করছে। মাদ্রাসার ছাত্রদের টহল: দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রকে ভারী অস্ত্র বা বিদেশি প্রশিক্ষণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। আদর্শিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে দেশের নিরাপত্তা দিচ্ছে। এটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যয় বহুগুণ কমিয়ে দিয়েছে।

৬. **প্রযুক্তিগত ফিল্টারিং:** ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ: রাষ্ট্র ইন্টারনেটকে ৩জি এবং ব্যয়বহুল করে দিয়ে বাইরের দেশের 'সফট পাওয়ার' (যেমন- পপ কালচার, সিনেমা, সোশ্যাল মিডিয়া) প্রবেশ রোধ করেছেন। এর ফলে সমাজের মানুষ বাইরের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থেকে নিজেদের কাজে ও ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারছে।